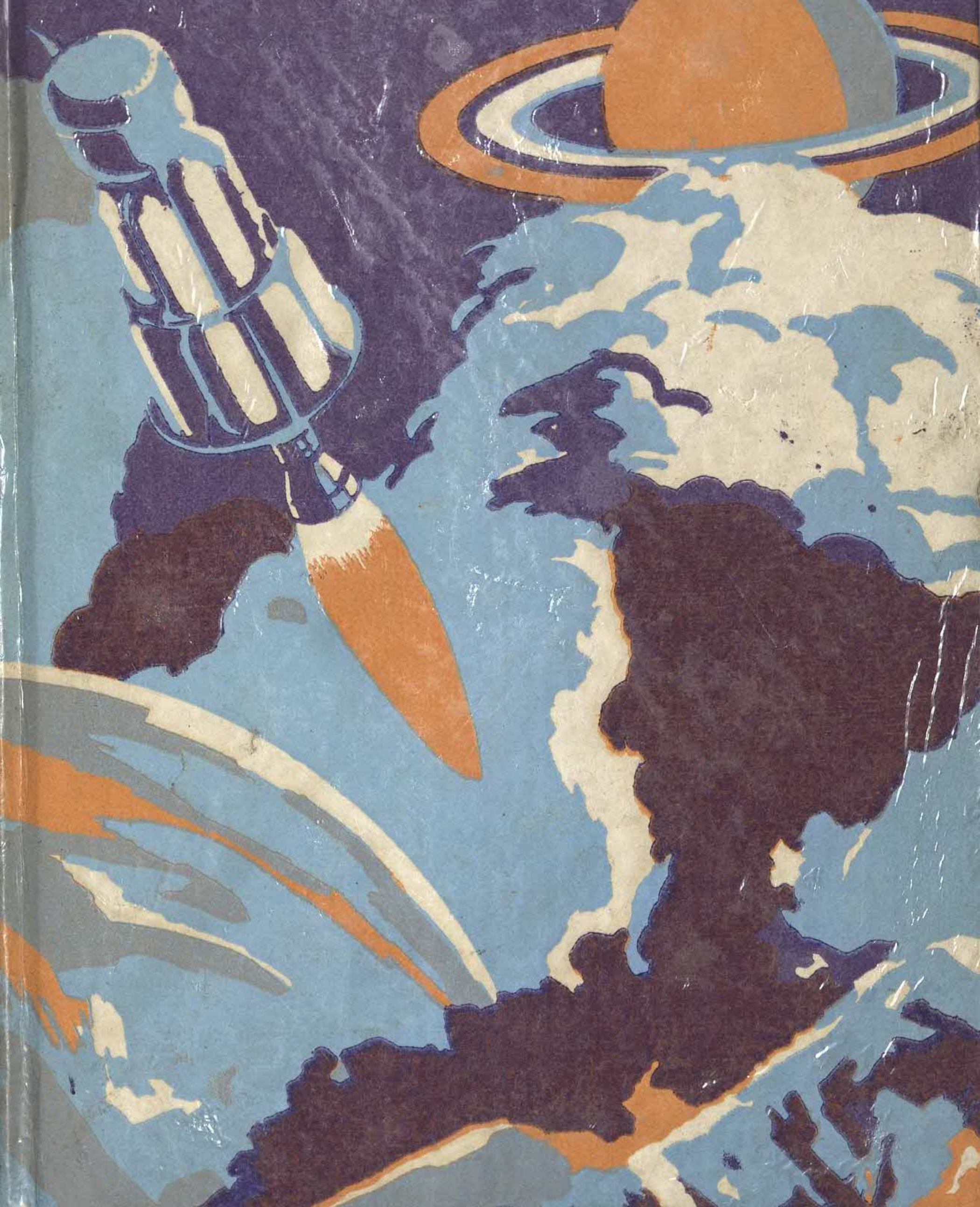
মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়

ভবেশ রায়



মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়

ভবেশ রায়

মুক্তধারা

মুক্তধারা ১১১৬

প্রকাশক ঃ
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা-১
বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ১৯৮৭
প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ প্রাণেশ মণ্ডল

মুদ্রাকর ঃ
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা-১
বাংলাদেশ

মূল্য ঃ সাদা ঃ ৪৫·০০ টাকা
লেখক কাগজ ঃ ৩০·০০ টাকা

MAHABISWER MAHABISMAY
[Miracle in Universe]
By Bhabesh Roy
First Edition : January 1987
Cover Design : Pranesh Mondal
Publisher : C. R. Saha

MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
74 Farashganj, Dhaka-1
Bangladesh

Price : Whiteprint : Taka 45·00
Lekhakprint : Taka 30·00

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন রায়
শ্রীযুক্তা পূর্ণলক্ষ্মী রায়
বাবা ও মাকে দিলাম

১৩৯৫

এই লেখকের

জয়তু বাংলাদেশ
স্বদেশ ও বিশ্বের ডায়েরী
শাহনামার কবি ফেরদৌসী
পলাশ কেনো কাঁদে
বিন্নি ধানের খই
টক ঝাল মিষ্টি
সোনার খনির সন্ধানে
জুলিয়াস সীজার ও ক্লিওপেট্রা

প্রসঙ্গতঃ

'মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়' মহাকাশ বিষয়ক কোনো সামগ্রিক আলোচনার বই নয়। মহাকাশ ও পৃথিবী সম্পর্কিত কিছু বিচিত্র বিষয়ের উপর গত এক দশকে বিভিন্ন সময়ে রচিত প্রবন্ধের সংকলন। যেহেতু এখানে কোনো ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়নি, তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই প্রসঙ্গ একাধিক প্রবন্ধে অনিবার্যভাবে পুনরুল্লিখিত হয়েছে। লেখার সময় প্রবন্ধগুলোকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার জন্যই এটি করতে হয়েছিলো।

বইটিতে সংকলিত প্রবন্ধের সবগুলোই আগে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তবে বর্তমান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তির সময় প্রতিটি প্রবন্ধই ব্যাপকভাবে সংশোধিত এবং কোনো কোনোটি সম্পূর্ণ পুনর্লিখিত হয়েছে। লেখায় সর্বশেষ তথ্যের সংযোজন করার জন্যই এমনটা হয়েছে। তাছাড়া আমার নিজের লেখার প্রতি নিজের মজ্জাগত একটি সার্বক্ষণিক অতৃপ্তির কারণতো আছেই।

তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারটি শুধু কষ্টসাধ্য নয় অনেক ক্ষেত্রে বিরক্তিকরও। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি প্রবন্ধের সম্পূর্ণ তথ্য পেতে আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে বছরের পর বছর। লেখা তৈরি হয়ে গেছে এবং পত্রিকায় প্রকাশের পরেও এমন নতুন তথ্য হয়তো হাতে এসেছে যা সংযোজন করতে গিয়ে হয় লেখাটাকে সংশোধন করতে হয়েছে, নয়তো সম্পূর্ণটাই ফেলে দিয়ে নতুন করে আবার লিখতে হয়েছে। গ্রন্থ প্রকাশের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিলো। এর যেনো কোনো শেষ নেই।

তথ্য আহরণ করতে গিয়ে আমাকে সাহায্য নিতে হয়েছে অসংখ্য দেশী-বিদেশী সংবাদপত্র, সাময়িকী, গবেষণা পুস্তক এবং বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থসমূহের। এই আহরণের ক্ষেত্র এতোই বিস্তৃত যে তার সামগ্রিক উল্লেখ প্রায় অসাধ্য। আমি সকলের প্রতি জানাই আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

দীর্ঘদিনের লেখা ও পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা প্রবন্ধগুলোকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের ক্ষেত্রে যাঁর সহযোগিতা ও আন্তরিকতা সর্বাধিক, তিনি হলেন 'মুক্তধারা'র স্বত্বাধিকারী পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। বইটির ছবি আঁকা ও অঙ্গ বিন্যাসের ব্যাপারে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃতুল্য প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীপ্রাণেশ মণ্ডল।

আমি বইতে বিজ্ঞানের কিছু কিছু জটিল বিষয়কে সহজ ভাষায় নিজের মনের মতো করে পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি। আমার এই শ্রম কতটুকু সার্থক হয়েছে তা জানা নেই। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনেরা যদি লেখাগুলোতে তাঁদের জানার মতো, মনে তৃপ্তি পাবার মতো কিছু খুঁজে পান—তাহলে মনে করবো আমার সাফল্য সেখানেই।

সতর্কতা সত্ত্বেও বইটিতে কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেলো। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

ভবেশ রায়
১৷১, পাতলা খান লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১

১লা জানুয়ারী, ১৯৮৭

সূচীপত্র

ঐ সুদূরের নীহারিকা

মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়। এ বিস্ময়ের শেষ নেই। কিন্তু সব চেয়ে বড় বিস্ময়কর প্রশ্ন হলো —এই অনন্ত বিশাল মহাবিশ্বের শেষ কোথায়? আর শুরুই বা কবে থেকে? কেমন করে এর জন্ম?

এই বিস্ময়কর প্রশ্নের কোনো সঠিক জবাব আজো বিজ্ঞানীরা খুঁজে পাননি। তর্ক হয়েছে যুগের পর যুগ ধরে। মতামত এসেছে একটির পর একটি। কিন্তু চূড়ান্ত সমাধান হয়নি আজো। হয়নি কোনো তর্কের অবসান।

এই বিস্ময়কর বিশ্বের সূচনা কেমন করে হয়েছিলো তার জবাব দিতে গিয়ে গত ১৯২০ সালে আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হব্বল (Edwin Hubble) প্রথমে বলেন,—আমাদের এই মহাকাশটা ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ বিশ্ব সতত চলমান। এরপর বেলজিয়ামের জ্যোতিবিজ্ঞানী জর্জেস লেমিটার (Georges Lemaitre) বলেন,—বিশ্বজগতের কার্যক্রমের শুরু হয় এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে।

অধিকাংশ বিজ্ঞানীই অবশ্য লেমিটার সাহেবের এই মতেরই সমর্থন করেছেন। তবে কারো কারো মতে ওই বিস্ফোরণ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মাত্রায় শুরু হয় এবং বস্তুসমূহ বিরাট ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করে। বিস্ফোরণের পর বিক্ষিপ্ত নীহারিকা (Nebula) সমূহ ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়ে শেষ প্রান্তের দিকে ছুটে চলেছে। অবশ্য এই অন্তহীন মহাবিশ্বের শেষ প্রান্ত বলে কিছু আছে কিনা কেউ জানেনা। কারণ নীহারিকাসমূহ যে ছুটে চলেছে তো চলেছেই। এর থেমে যাওয়ার কোন লক্ষণ নেই। বিজ্ঞানীরা বলেন,—প্রায় দেড় হাজার থেকে দু'হাজার কোটি বছর আগে এই মহা বিস্ফোরণের

(Big Bang Explosion) ধ্বনির মধ্য দিয়ে এই বিশ্বের সূচনা ঘটে।

কিন্তু তবু প্রশ্ন জাগে, এই মহাশব্দই বা কেমন করে সৃষ্টি হয়েছিলো? তারও সঠিক জবাব বিজ্ঞানীরা দিতে পারেননি। বিস্ফোরণের আগে নাকি বিশ্বের বস্তুসমূহ একটি কেন্দ্রবিন্দুতে সংযুক্ত ছিলো। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, বস্তু ও বস্তুবিরোধী শক্তির মধ্যকার সংঘর্ষের ফলেই এই মহাশব্দ ঘটে। প্রথমত, বস্তুবিরোধী শক্তির চাইতে বস্তুর পরিমাণ সামান্য বেশি ছিলো। সুতরাং বিস্ফোরণের পর কিছু বস্তু অবশিষ্ট থেকে যায়। এই অবশিষ্ট অংশটাই হলো বর্তমানের আলোচ্য বিশ্ব।

এটাই হলো এযাবৎকালের সকল বিজ্ঞানী কর্তৃক স্বীকৃত মতবাদ। তবে কোনো কোনো বিজ্ঞানী এই মহাবিস্ফোরণবাদ সম্পর্কে ভিন্ন মতবাদও দিয়ে থাকেন। যদিও এই ভিন্ন মতবাদ স্বীকৃতি লাভ করেনি। মহাবিস্ফোরণবাদ সম্পর্কে এই ভিন্নমতবাদটি দিয়েছেন দক্ষিণ আমেরিকার তাত্ত্বিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক জর্জ এলিস ১৯৭৮ সালে।

তাঁর মতে, আমাদের পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছে। তিনি বলেন,—কস্মিনকালেও বিরাট বিস্ফোরণ ঘটেনি, বিশ্ব অনাদি-কাল থেকে বিরাজমান এবং কখনো সম্প্রসারিত হচ্ছে না, স্থিতিশীল রয়েছে সর্বক্ষণ। পৃথিবী এবং তার প্রতিবেশী জ্যোতিষ্কমণ্ডল বিশ্বের একটা বিশেষ স্থানে অবস্থান করছে। বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে একটা নিরিবিলি এলাকায় নিঃসঙ্গ কিছুর অবস্থান আছে, সেখানে পদার্থবিদ্যার সাধারণ নিয়ম অচল। এখানে ক্ষুদ্রাকার নেপথ্যে অবস্থানকারী একটি স্থান থেকে বিরাট বিস্ফোরণের মতো সতত তাপ বিকিরণ হয়ে আসছে। তিনি আইনস্টাইনের তত্ত্ব প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন, কিভাবে স্থান চক্র আপন অবস্থানে ফিরে আসছে এবং এভাবেই সৃষ্ট এক কেন্দ্রতাত্ত্বিক শক্তির মর্মকেন্দ্রে আমাদের পৃথিবী অবস্থান করছে।

কিন্তু বিজ্ঞানী এলিসের এই মতবাদ এখনো কেউ স্বীকার করে নেননি।

না, নেয়ার প্রধান কয়েকটি কারণ রয়েছে। তার মধ্যে একটি কারণ হলো, বিজ্ঞানীরা শক্তিশালী দুরবীন দিয়ে মহাবিশ্বের মধ্যভাগটা দেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা যা দেখেছেন তাতে মনে হয় মহাবিশ্ব ক্রমাগতই পরিবর্তিত হচ্ছে। আগের চেয়ে এর অনেক পরিবর্তন ঘটছে। স্থির মতবাদ সত্যি হলে এমনটা হবার কথা ছিলোনা।

আর মহাবিশ্বের কোয়াসার নামে এক বিস্ময়কর বস্তু রয়েছে। পৃথিবী থেকে বহু দূরে এগুলোর অবস্থান। এক একটি কোয়াসার থেকে আলো এসে পৌঁছতে সময় লাগে কোটি কোটি বছর। সুতরাং তাদের এখন যেঅবস্থায় দেখা যাচ্ছে সৃষ্টির আদিতেও তেমনি দেখা যাবার কথা ছিলো। কিন্তু তা হচ্ছে না। কোনো কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানী মনে করেন, এই কোয়াসার হলো একটি নতুন গ্যালাক্সি বা নীহারিকা জন্ম হওয়ার প্রাথমিক স্তর। এখন বিশ্বে কোথাও কোয়াসার নেই। সবগুলো গ্যালাক্সিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আর এতেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে বিশ্ব ক্রমেই বুড়ো হয়ে যাচ্ছে.

তৃতীয় কারণটি হলো—বিজ্ঞানীরা এই মহাবিস্ফোরণের কতগুলো লক্ষণও খুঁজে পেয়েছেন। এ ধরনের একটা বিস্ফোরণ যে সত্যি ঘটেছিলো তার কিছু কিছু প্রমাণও তাঁরা পেয়েছেন। যেমন—মহাবিশ্বের সর্বত্র সমান তাপমাত্রা নেই। কোথাও বেশি ঠান্ডা আবার কোথাও উষ্ণ। এটাতেই প্রমাণ করে বিস্ফোরণের সময় যে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছিলো তারই কিছু কিছু কোথাও কোথাও ছড়িয়ে আছে আজো।

চতুর্থ আর একটি মতবাদ আছে। এটি হলো সংকোচন মতবাদ। এটা মহা বিস্ফোরণ বাদেরই সংশোধন মাত্র। এঁরা বলেন, মহা বিস্ফোরণের পর থেকেই বিশ্ব ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। তবে এই সম্প্রসারণের গতিবেগ ক্রমেই কমে আসছে। একদিন হয়তো এর সম্প্রসারণ থেমেও যেতে পারে এবং আবার হয়তো এই ছড়িয়ে পড়া পদার্থগুলো পিছন ফিরে ছুটতে পারে। আর এমনি করে ছুটতে ছুটতে আবার ফিরে আসতে পারে পূর্বের অবস্থায়। সেই মহাবিস্ফোরণ ঘটার অবস্থায়।

তবে তার কোনো নিশ্চয়তা বিজ্ঞানীরা দিতে পারছেন না। কারণ বিশ্বের সম্প্রসারণের গতি আজো অব্যাহত রয়েছে। থেমে যাবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, অন্তত যতক্ষণ

পর্যন্ত তারাগুলোর আলো আছে, শক্তি আছে এবং সারা বিশ্বে অন্ধকার নেমে না আসছে, ততক্ষণ এই সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকবেই।

॥ ২ ॥

মহাবিস্ফোরণের ফলে যে বস্তুসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে মহাকাশে ছুটে চলেছে, সেই পদার্থসমূহই নীহারিকা নামে পরিচিত। এই নীহারিকাকে ইংরেজীতে বলে নেবুলা (Nebula). এগুলো আসলে হলো এক ধরণের হালকা গ্যাসের অতিকায় পিণ্ড। আকাশের বুকে এরা তাদের প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে ঘূর্ণিবায়ুর মতো পাক খেতে খেতে কোটি কোটি কিলোমিটার জায়গা জুড়ে শুধু জ্বলছে আর জ্বলছে।

এই নীহারিকাগুলোর আকার নানা রকম। কোনোটি ডিমের মতো গোল, কোনোটি থালার মতো চ্যাপ্টা, আর কোনোটি স্ক্রুর মতো প্যাঁচানো। আর নীহারিকা সম্পর্কে বড় কথা হলো—আকাশ জোড়া ওই যে অগণিত নক্ষত্ররাজি, গ্রহ উপগ্রহসহ সূর্যে গড়া আমাদের সৌরজগৎ, এসবই ওই নীহারিকা থেকেই সৃষ্টি। এই তারা সমন্বিত নীহারিকাকে ইংরেজীতে গ্যালাক্সি (Galaxy) বলে। নীহারিকার ভাসমান হালকা মেঘপুঞ্জ (Magellatic clouds) জমাট বেঁধেই সৃষ্টি হয় তারকার।

এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা মহাকাশে প্রায় একশো কোটি গ্যালাক্সির সন্ধান পেয়েছেন। এই একশোটির মধ্যে একটিতে আছে আমাদের সৌর জগৎ। আমরা যার বাসিন্দা।

আমরা যে গ্যালাক্সির মধ্যে বাস করি তার আবার আলাদা একটি নামও আছে। অন্য সব গ্যালাক্সি থেকে আলাদা করে দেখানোর জন্যই এই ভিন্ন নাম দেয়া হয়েছে। এর নাম হলো 'আকাশগঙ্গা' বা 'ছায়াপথ', ইংরেজীতে বলে The Milky Way. এই ছায়াপথকেই আমরা রাতের আকাশে এপার থেকে ওপার পর্যন্ত দুধের ন্যায় সাদা রঙের পথের মতো দেখি। ওর সাদা অংশটা হলো গ্যাস আর এরই মাঝে ভেসে বেড়াচ্ছে আমাদের সূর্যের মতো কোটি কোটি তারা।



এক পাশ থেকে তোলা ছায়াপথের ছবি। মাঝের যোগ (+) চিহ্নিত অংশটি ছায়াপথের কেন্দ্র বিন্দু। এই কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে বাম পাশের তীর চিহ্নিত অংশে সৌরজগতের অবস্থান। ওখানেই আমাদের পৃথিবী।

আমরা ছায়াপথ নামে এই যে গ্যালাক্সিতে বাস করি, এর ব্যাস হলো এক লাখ আলোকবর্ষ আর ঘনত্ব দু'হাজার আলোকবর্ষ। এর আবার একটি কেন্দ্রবিন্দুও আছে। এই কেন্দ্রবিন্দু থেকে আমাদের সৌর জগৎ প্রায় তিরিশ লাখ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। ছায়াপথ একটি প্যাঁচানো গ্যালাক্সি।

এই ছায়াপথের আশেপাশে আরো অনেক গ্যালাক্সি আছে। মহকাশের বুকে আমাদের সবচেয়ে কাছের গ্যালাক্সিটির নাম হলো এ্যান্ড্রোমিডা (Andromeda). এর আকৃতিও প্রায় আমাদের ছায়াপথের মতোই। এই এ্যান্ড্রোমিডার এক পাশ থেকে অন্য পাশের দূরত্ব চল্লিশ হাজার আলোকবষ।

মহাকাশের এমন দূরদূরান্তেও বহু গ্যালাক্সি আছে, যার আলো আমাদের পৃথিবীতে এসে পেঁছিতে সময় লাগবে প্রায় পাঁচশো কোটি বছর।

॥ ৩ ॥

সারা বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বড় বিস্ময় আর রহস্যময় হলো এই গ্যালাক্সি। বিজ্ঞানীরা মহাকাশের এই গ্যালাক্সিগুলোর গতি প্রকৃতি আচার আচরণ নিয়ে যতই পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন ততই বিস্মিত হচ্ছেন।

বিজ্ঞানীরা শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে মহাকাশের বহু দূর দূরান্তে দৃষ্টি মেলে ধরে আবিষ্কার করছেন নতুন নতুন গ্যালাক্সি। লক্ষ্য করছেন তাদের গতি বিচিত্র প্রকৃতি।

মহাকাশের বুকে এই রহস্যময় গ্যালাক্সি নিয়ে যারা গবেষণা করছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেন, আমেরিকার আরিজুনা রাজ্যে অবস্থিত কিট্‌পীক ন্যাশনাল অবজারভেটরী (Kitt Peak National Observatory) এর বিজ্ঞানী মিঃ এ্যালেন সাণ্ডাজ (Allan Sandage.).

তিনি বলেন,—মহাকাশের বিস্ময় এই গ্যালাক্সি নিয়ে গবেষণা করার সময় তাঁরা লক্ষ্য করেছেন, এদের অনেক বিচিত্র রহস্যময় গতি প্রকৃতি। মহাকাশে ছুটে চলেছে হরেক রকম আর বিচিত্র গঠনের সব গ্যালাক্সি। এদের কোনোটি আকৃতিতে যেমন প্রকাণ্ড বড়, কোনোটি বা আবার তেমনি ক্ষুদ্রাকৃতি।

এই ছোটো, বড়, মোটা, তাজা বিচিত্র ধরণের গ্যালাক্সিগুলো প্রত্যেকে তার আপন বৃত্তে চক্কর দিতে দিতে ছুটে চলেছে প্রচণ্ড গতিতে। কিন্তু এই ছুটে চলতে চলতেই ঘটাচ্ছে বিচিত্র সব কাণ্ড কারখানাও। এই ছুটতে ছুটতেই এদের টক্কর লাগছে একটির সাথে অন্যটির। এই সংঘর্ষে ঘটছে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। একেবারে প্রলয় কাণ্ড যাকে বলে। কখনো কখনো এমনও হচ্ছে, বড় বড় গ্যালাক্সিগুলো চলতে চলতেই গ্রাসকরে ফেলছে তার আশপাশের ছোটো কোনো রোগা পটকা গ্যালাক্সিকে। তারপর মনের আনন্দে নিজেই খাচ্ছে ডিগবাজী। সে যেন সত্যি এক বিচিত্র দৈত্য দানবের খেলা।

এই যে কাণ্ড কারখানার কথা বলছি—এগুলো কিন্তু ঘটছে আমাদের সৌরজগৎ থেকে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে। তাই এতে

হয়তো কেউ মনে করতে পারেন—ওরা কি করছে না করছে তা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই।

কিন্তু তা নয়। এদের এই বিচিত্র খেলা আমাদেরকেও অনেক সময় প্রভাবিত করে। যেমন—একদল বৃটিশ জ্যোতিবিজ্ঞানী পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বলেছেন যে,—মহাকাশের ভাসমান গ্যালাক্সিসমূহ সুদূর সৌর জগতের উপরেও প্রভাব বিস্তার করে অনেক সময়।

যেমন—আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবীর বুকে একবার নেমে এসেছিলো প্রচণ্ড শীতলতা। ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছিলো সারা পৃথিবী। ভূ-পৃষ্ঠ ঢেকে গিয়েছিলো সাদা বরফে। এই যে ভয়ংকর সময়টা এটাই 'বরফ যুগ' নামে খ্যাত।

বৃটিশ বিজ্ঞানীরা বলেন,—মহাকাশের কোনো একটি বিশাল গ্যালাক্সির গ্যাস ও মহাজাগতিক ধুলোর ঝাপটাতেই এই কাণ্ড হয়েছিলো। সারা সৌর জগতের আবহাওয়ার ঘটেছিলো পরিবর্তন। নেমে এসেছিলো প্রচণ্ড শৈত্য।

বিজ্ঞানীরা বলেন,—মহাজগতের কাণ্ডকারখানা শুধু পৃথিবী কেন, পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু তথা মানুষসহ প্রতিটি প্রাণির উপরেও প্রভাব ফেলতে পারে।

কারণ আমাদের শরীরে যে যে ধরণের গ্যাসীয় ও ধাতব পদার্থ রয়েছে, এই একই পদার্থ রয়েছে বিশ্বের প্রতিটি গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যেও। একদিক দিয়ে বিচার করলে পৃথিবীর প্রাণিদের সাথেও বিশ্ব জগতের গ্রহ নক্ষত্রের পরম আত্মীয়তা রয়েছে। তাই তারা যত দূরেই থাক, তাদের একটা আকর্ষণ তো থাকতেই পারে।

॥ ৪ ॥

মহাকাশের গ্যালাক্সিগুলোতো যে যার আপন নিয়মে ছুটে চলেছে কোন অজানার দিকে। এই ছুটে চলতে গিয়েই কখনো তারা এসেছে পরস্পরের কাছাকাছি। কখনো হয়ে যাচ্ছে গুচ্ছবদ্ধ।

আকাশে যেমন তারার গুচ্ছ আছে, জোড়া তারা আছে, তেমনি জোড়া গ্যালাক্সিও আছে।

এই যেমন আমাদের নিজস্ব গ্যালাক্সি—ছায়াপথ, এই ছায়াপথের নিকটতম গ্যালাক্সি এ্যান্ড্রোমিডা। এই ছায়াপথ বা মিল্‌কীওয়ে আর

এ্যান্ড্রোমিডা কিন্তু মহাকাশে এমনি একটি জোড়া গ্যালাক্সি। এ ধরণের জোড়া গ্যালাক্সি মহাকাশে আরো অনেক আছে।

গভীর মহাকাশে অনুসন্ধান চালিয়ে বিজ্ঞানীরা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করছেন গ্যালাক্সি সমূহের এই গতিবিধি। এই অনুসন্ধান থেকেই জানা যাচ্ছে, এই গ্যালাক্সিগুলো কতটা গতিতে ছুটে চলেছে, কিংবা তাদের গতি বাড়ছে, কি কমছে। তারা অনন্তকাল এভাবেই চলবে, নাকি তাদের গতি থেমে যাবে একদিন। নাকি আবার তারা ছুটতে থাকবে পেছন দিকে।

শুধু ছুটে চলাই নয়, তাঁরা গ্যালাক্সিসমূহের অনেক বিচিত্র বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করেছেন। দেখা যাচ্ছে, মহাকাশের কোনো কোনো গ্যালাক্সিতে নিত্য নতুন তারার জন্ম হচ্ছে। কোনো কোনো গ্যালাক্সিতে আর তারার জন্ম হচ্ছে না। কিন্তু এমনটা হচ্ছে কেনো?

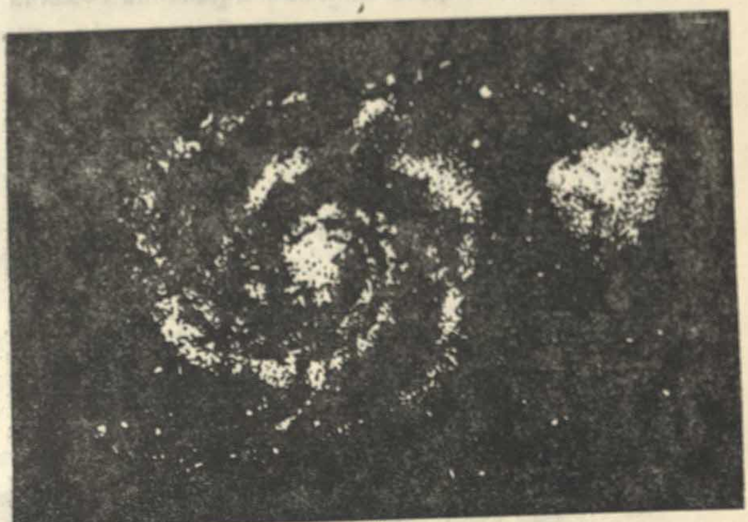
এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, গ্যালাক্সির মধ্যকার ভাসমান মহাজাগতিক ধূলিকণা আর গ্যাস জমাট বেঁধে বেঁধেই জন্ম হয় নতুন তারার। যেসমস্ত গ্যালাক্সির মধ্যেকার ধূলিকণা আর গ্যাস শুকিয়ে গেছে সেখানে আর তারার জন্ম হতে পারে না। আর যেসব গ্যালাক্সি বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং তরতাজা, মহাজাগতিক ধূলিকণা আর গ্যাসে পরিপূর্ণ, সেখানেই জন্ম হচ্ছে নিত্য নতন-নতুন তারার।

উল্লেখ্য যে, আমাদের ছায়াপথও এককালে এমনি একটি তরতাজা, গ্যালাক্সি ছিলো। আর তাইতো এখানে জন্ম নিয়েছে কোটি কোটি নতুন নতুন তারা। কিন্তু আজ থেকে ছয় বিলিয়ন বছর আগে আমাদের ছায়াপথ নতুন তারার জন্মদান বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের সূর্য হয়তো ছায়াপথের প্রায় সর্বশেষ সন্তান।

ভাগ্যিস, আমাদের সূর্যের জন্মের আগেই ছায়াপথ বন্ধ্যা হয়ে যায়নি। তা হলে হয়তো আমাদের কারো জন্মই হতো না। সূর্যই যদি না থাকতো তা হলে পৃথিবী সৃষ্টি হতো কেমন করে? আর পৃথিবী সৃষ্টি না হলে আমরাই বা জন্ম নিতাম কোথায়?

পৃথিবীর প্রাণিজগতের মতোই মহাজগতেও একই ঘটনা ঘটছে। প্রাণিজগতে দুর্বলের বেঁচে থাকার কোনো পথ নেই। দুর্বল মানুষ অন্যের অত্যাচার সম্পর্কে সদা সতর্ক। বনের দুর্বল প্রাণি সবলের ভোগ্য বস্তু। মহাকাশের গ্যালাক্সিদের বেলায়ও এ কথা প্রযোজ্য

মহাকাশের সবল আর প্রকাণ্ড আকৃতির গ্যালাক্সিগুলো ধ্বংস করে ফেলেছে দুর্বল গ্যালাক্সিগুলোকে। যেখানে গ্যালাক্সির ভিড় বেশি, সেখানকার গ্যালাক্সিগুলোর স্বাস্থ্যও তেমনি দুর্বল। প্রকৃতির নিয়ম সর্বত্র একই রকম। এরাই পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পরস্পর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বড়দের চাপে পড়ে বিপন্ন হচ্ছে ছোটদের জীবন।



মহাকাশে যে কোটি কোটি নানা আকৃতির গ্যালাক্সি রয়েছে এটিও তাদের অন্যতক। এটি একটি প্যাঁচানো গ্যালাক্সি।

এই যে মহাকাশের বিস্ময়কর গ্যালাক্সিদের জন্ম মৃত্যু, সংঘর্ষের কথা বললাম, এই কাজগুলো কিন্তু আমার বলার মতোই অমন সহজে হয় না। অমন রাতারাতিও কিছু ঘটে না।

হয়তো মহাকাশের বুকে ছুটে চলতে চলতে দুটি গ্যালাক্সির মধ্যে পরস্পরে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে অপেক্ষাকৃত দুর্বল গ্যালাক্সিটি ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু এই ধরনের একটি সংঘর্ষ আর ধ্বংস হতে সময় লাগে কোটি কোটি বছর। একজন ধৈর্যশীল জ্যোতি-বিজ্ঞানী যদি এ ধরনের একটি ঘটনা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করতে চান, তাহলে তাঁকে দূরবীনে চোখ লাগিয়ে বসে থাকতে হবে কয়েক কোটি বছর। কিন্তু তাকি সম্ভব?

তাহলে বিজ্ঞানীরা এই অসম্ভবকে সম্ভব করছেন কেমন করে? কেমন করে তাঁরা কোটি কোটি বছরের বিবর্তন ধারাকে আজ মাত্র কয়েক বছরের গবেষণায় হিসেব করে বের করছেন?

এর সবই সম্ভব হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে। বিজ্ঞানীরা আজ এমন সব উন্নত কারিগরি জ্ঞান অর্জন এবং অত্যাশ্চর্য যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছেন যাতে এখন আর কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।

বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন মহাকাশ গবেষণার উন্নতমানের কম্পিউটার। কম্পিউটারে সাইমালটেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা একই সময়ের মধ্যে একটি বস্তুর অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারছেন। কম্পিউটারের সাহায্যে একটি বা দুটি গ্যালাক্সির বর্তমান অবস্থা আর অবস্থান দেখেই বলে দিতে পারেন আজ থেকে কয়েক লাখ কিংবা কোটি বছর আগে তাদের অবস্থা বা অবস্থান কেমন ছিলো। ভবিষ্যতে লাখো বছর পরে তাদের অবস্থা কেমন হবে। এর জন্য এখন আর কোটি বছর ধরে তাকিয়ে থাকার দরকার নেই।

এই যন্ত্রের সাহায্যেই বিজ্ঞানীরা আজ একটি গ্যালাক্সির বর্তমান রূপ দেখে বলে দিতে পারেন, অতীতে এর আকৃতি কেমন ছিলো, পরে কেমন হবে।

বিজ্ঞানীরা মহাকাশে কিছু কিছু গ্যালাক্সির দেখা পেয়েছেন, যেগুলো আকৃতি অবিকল ধোঁয়ার রিঙের মতো। সিগারেট টেনে ধোঁয়া ছাড়লে যেমন রিং হয়। চার পাশে রিং, মাঝে ফাঁকা, অবিকল চাকার মত।

এ ধরনের কিছু গ্যালাক্সির জন্ম রহস্য বিজ্ঞানীরা এই যন্ত্রের সাহায্যেই ধরতে পেরেছেন। তাঁরা বলেন,— আগে এগুলোর আকৃতি এমন ছিলো না। মাঝের ফাঁকা জায়গাটা ভরাট ছিলো।

কিন্তু মাঝখানটা ফাঁকা হয়ে যাওয়ার মূলে আছে তারই আশে-পাশের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদে গ্যালাক্সি। এই ক্ষুদে গ্যালাক্সিগুলোই সহসা চক্কর খেতে খেতে ঢুকে পড়েছিলো তার পেটের ভিতর। তারপর তাকে এফোঁড় ওফোঁর করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে আপন পথে। বেচারীর পেটটা গেছে ফুটো হয়ে।

এ ধরনের পেট ফুটোওয়ালা গ্যালাক্সিগুলোর আশেপাশেই পাওয়া গেছে এমনি ধরনের ক্ষুদে গ্যালাক্সি। ছোট বড় নানা ধরনের গ্যালাক্সির মধ্যে যখন সংঘর্ষ হয় তখনই কোনো কোনো সময় এ ধরনের মজার কাণ্ড ঘটে।

॥ ৫ ॥

এই গ্যালাক্সিগুলো মূলত ছড়ানো ছিটানো। একেবারে জমাট বাঁধা কোনো কিছু নয়। তবে এর কেন্দ্রের দিকটা বেশ ঘন। এটাই হলো গ্যালাক্সির মহাশক্তিধর পরমাণু কেন্দ্রবিন্দু। এখানে তারার ঘনত্বও খুব বেশী। এজন্য এটাকে বলা হয় The Grand Central Terminal of Stars. এই মহাকেন্দ্র বিন্দুতে কি হয় তার রহস্য জানা আজো কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। এটা মহাকাশের এক একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ বিশেষ।

এই রহস্যময় মহাজাগতিক পরমাণু কেন্দ্রবিন্দু থেকেই মাঝে মাঝে তীব্র আলো এবং বিচিত্র বেতার তরঙ্গ ভেসে আসছে। আমাদের যে নিজস্ব গ্যালাক্সি ছায়াপথ, সেই ছায়াপথের পারমাণবিক কেন্দ্র থেকেও এ ধরনের বেতার তরঙ্গ ভেসে আসছে সতত।

এখানেই বিজ্ঞানীরা দুটি মহাবিস্ময়কর বস্তুরও সন্ধান পেয়েছেন। এর একটি হলো কৃষ্ণ গহবর (Black Hole) আর অপরটি হলো কোয়াসার (Quasars).

মহাকাশে এমন কিছু কিছু ভৌতিক অন্ধকার স্থান আছে যেখানে কোনো দৃষ্টি পর্যন্ত চলে না। শক্তিশালী দূরবীন দিয়েও সেখানে কিছু দেখা যায় না। যেন একটি বিশাল অন্ধকার গর্ত।

এটা এমনি এক ভয়াবহতম ভৌতিক স্থান যে এখানে চারপাশের সমস্ত বস্তু, আলো, শব্দমালা পর্যন্ত মুহূর্তে ঢুকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। মোট কথা এখান দিয়ে যা কিছু যাবে তা-ই এই গর্তে পড়ে বিলীন হয়ে যাবে।

কিন্তু কি যে এর রহস্য, বিজ্ঞানীরা তা কিছুতেই ধরতে পারছেন না। কি আছে ওই অতিকায় ভৌতিক কালো গর্তের ভিতরে?

বিজ্ঞানীরা জানার চেষ্টা করছেন, কেমন করে মহাকাশের বুকে জন্ম নেয় অমন ভৌতিক গর্তের। তারা অনুমান করেন, যখন মহাকাশে কোনো কোনো সময় এমন হয়, দৈত্যাকৃতির এক



মহাকাশের একটি ঘন তারার ঝাঁক। এমনি ধরনের ঘন তারার ঝাঁক মহাকাশে অসংখ্য আছে। আমাদের ছায়াপথের ভিতরেও এ ধরনের অনেক তারার ঝাঁক রয়েছে।

বা একাধিক তারা কোনো কারণে অকস্মাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন তাদের শরীর থেকে বিচ্ছুরিত বিপুল পরিমাণ তীব্র আলোকরশ্মি অবিশ্বাস্য রকমের ঘন হয়ে আসে। এই প্রচণ্ড ধাক্কায় সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড রকমের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির। এই শক্তির পরিমাণ এতো বিপুল যে, এর আওতার মধ্যে যা কিছুই থাকুক না কেন, এই মহাশক্তি তাকে মুহূর্তে গ্রাস করে ফেলে। আলো, বেতার তরঙ্গ সব কিছুকে সে ক্ষুধার্ত হিংস্র রাক্ষসের মতো গিলতে থাকে। কিন্তু নিজে থাকে অদৃশ্য। এক অদৃশ্য কালো মাথা দৈত্য হলো এই কৃষ্ণ গহবর।

এ জন্য বিজ্ঞানীরা এই ব্ল্যাক হোল নিয়ে খুব বেকায়দায় পড়েছেন অনেকেই বিশ্বাস করেন, মহাকাশের এ ধরনের ভৌতিক গর্তের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু তার অবস্থান কোথায়, তার সীমানা কতটুকু; এতোটা নির্দিষ্ট করে মাপা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। আর এ জন্যই কোনো কোনো বিজ্ঞানী এর অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, ওটা হয়তো মহাকাশের অন্য কিছু রহস্য।

কিন্তু সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এক্স-রে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পরীক্ষা চালিয়ে কিছু কিছু সংকেত লাভ করেছেন। যাতে তাঁরা মনে করেন, মহাবিশ্বের কোনো কোনো স্থানে এ ধরনের সত্যিকার ব্ল্যাক হোল থাকতে পারে। তাঁরা তার কিছু সংকেতের সন্ধানও পেয়েছেন।

যেমন—মহাকাশে 'এম-৮৭' নামে একটি প্রকাণ্ড দৈত্যাকৃতির গ্যালাক্সি রয়েছে। এর মাঝখানেই লক্ষ্য করা গেছে এমনি একটি প্রকাণ্ড কালো গর্ত। এটি হয়তো সত্যিই একটি ব্ল্যাক হোল।

॥ ৬ ॥

মহাকাশে আরো যে একটি আশ্চর্য বস্তুর কথা বললাম, তা হচ্ছে 'কোয়াসার'। মহাকাশের বিস্ময়কর বস্তু এই কোয়াসার। বিজ্ঞানীরা এর সন্ধান পেয়েছেন ১৯৬০ সালে। এই কোয়াসারকে মহাকাশে দেখা যায় ক্ষুদ্র একটি বিন্দুর মতো। এমন কি সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবীনের মধ্যে তাকিয়েও কোয়াসারের কোনো কৌনিক মাপ পাওয়া যায় না।

কিন্তু এই ক্ষুদ্র আলোকবিন্দু থেকেই বিকিরণ হয় আমাদের ছায়াপথের প্রায় পনেরো হাজার কোটি তারার মিলিত আলোর চেয়েও একশ' গুণ বেশি আলো।

এই যে অত্যাশ্চর্য জাজ্বল্যমান বিন্দু। মহাজাগতিক মাপকাঠিতে যার মাপ অতি সামান্য, তা থেকেই নিঃসৃত হয় শক্তিশালী রেডিও গ্যালাক্সির সমপরিমাণ শক্তি।

এই অদ্ভুত কোয়াসারগুলো সম্পর্কে পরীক্ষা চালাতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আরো লক্ষ্য করেছেন যে, এদের অবস্থান দৃশ্যমান বিশ্বের একেবারে প্রান্তে, আমাদের পৃথিবী থেকে একেবারে শত শত কোটি আলোকবর্ষ দূরে। একটি কোয়াসারের ব্যাস সৌর-মণ্ডলের চেয়ে বেশি নয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো—কোয়াসারের এই বিপুল শক্তির উৎস কি? কেনো এই বহদূরের বস্তুটি একই সঙ্গে এতো শক্তিশালী বিদ্যুৎ শক্তির উৎস? কেনো মহাকাশের এই বালুর কণাগুলো থেকে শত শত কোটি তারার চেয়েও বেশি শক্তি নিঃসৃত হয়ে থাকে? শক্তি উৎপাদনের কি আশ্চর্য কলাকৌশল প্রকৃতি আবিষ্কার করেছে?

তবে একটি বিষয়ে বিজ্ঞানীরা একমত যে, শুধুমাত্র পারমাণবিক ক্রিয়ায় এমন বিপুল পরিমাণ শক্তি লাভ করা সম্ভব নয়।

এ বিষয়ে প্রথম যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি লাভ করেছে, সেটি উপস্থিত করেছেন রাশিয়ার জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞানী নিকোলাই কার্দশেভ। তিনি বলেন,—এমনও হতে পারে যে, গ্যালাক্সির নিউক্লিয়াসে তারা গড়ে ওঠার তীব্র একটি প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে। জন্ম নিচ্ছে ঘন তারার ঝাঁক এবং তারায় তারায় চলছে অবিরাম সংঘর্ষ। এই বিস্ময়কর প্রচণ্ড ঝাপটা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে সুপারনোভার বিস্ফোরণ। এরফলে তৈরি হচ্ছে পালসার (নিউট্রন তারা) এবং তা থেকে আন্তঃগ্যালাকটিক মহাকাশে ভেসে আসছে প্রচন্ড শক্তির তরঙ্গ।

বিজ্ঞানীরা এই সাধারণ বিষয়টিও অবশ্য হিসেব করে দেখেছেন। কিন্তু তাতেও সমস্তটা বোঝা গেলো না। কারণ তারায় তারায় সংঘর্ষ ঘটার মতো মহা বিপর্যয়কর কাণ্ড ধরে নিলেও সেটা কোয়াসার

থেকে নিঃসৃত বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে না।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ থেকে একথা জানা যায় যে, যে সকল তারার ভর সূর্যের চেয়ে অন্ততঃপক্ষে দুই বা তিনগুণ বেশি, সেগুলো তাদের নিউক্লিয়ার জ্বালানি পুড়ে শেষ হবার পর মহাকর্ষ শক্তির ক্রিয়ায় সংকুচিত হতে শুরু করে এবং তা থেকে সৃষ্টি হয় ব্ল্যাক হোল।

এই মহাজাগতিক দৈত্যের ভর দশ লাখ সূর্যের কাছাকাছি হতে পারে এবং তার অবস্থান হয় তারার একটি ঝাঁকের মধ্যে। তা যদি হয় তবে তার সর্বগ্রাসী মহাকর্ষের টানে বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় তারাগুলোর থেকে নিঃসৃত গ্যাস একসাথে জড়ো হয়ে চলে।

সব কিছুই হয় এই তত্ত্বের সাথে খাপ খেয়ে। এমন কি এই যে বিপুল শক্তির কথা বলছি এটিও। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্ল্যাক হোল ও কোয়াসার উৎসারিত সর্বোচ্চ শক্তি এবং বর্ণালীর দৃশ্যমান আলো অতি বেগুনী এলাকায় পড়া উচিত। কিন্তু তা পড়ছে না। পড়ছে গিয়ে অবলোহিতের এলাকায়। এছাড়াও এ বিষয়ের আরো কিছু কিছু ব্যাখ্যা এই মডেল থেকে পাওয়া যায় না।

প্রত্যেক গ্যালাক্সিতে আছে কোটি কোটি তারা এবং সেই তারা থেকে নিঃসৃত হয়ে থাকে বিপুল পরিমাণ গ্যাস। মহাকর্ষের শক্তির ক্রিয়ায় এই গ্যাস ধাবিত হয় গ্যালাক্সির কেন্দ্রের দিকে। তাহলে বিজ্ঞানীদের হিসেব মতে প্রায় দশ কোটি বছর ধরে এই সমস্ত গ্যাস মিলে একটি বিশাল বস্তু গড়ে ওঠা উচিত। তার আকার হবে প্রায় একশ' কোটি সূর্যের সমান।

এই অতিবৃহৎ তারাটি আবর্তিত হয় এবং এর চারপাশ ঘিরে থাকে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র। হিসেব থেকে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, তারাটির এই দুটি বৈশিষ্ট্য যদি না থাকে, তাহলে অতিকায় এই বস্তুটি কোয়াসার বিকিরণের অবস্থায় থাকতে পারে মাত্র দশ বছর (পৃথিবীর হিসেবে)। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে এর এই বিক্ষুব্ধ অবস্থা চলে প্রায় লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। এজন্যই এই অসাধারণ তারাটিকে বলা হয় 'ম্যাগনেটয়েড'।

এতো দীর্ঘকাল স্থায়ী একটি আবর্তনকারীর নির্মাণ কেমন করে সম্ভব হলো? বিষয়টি অবশ্যই যথেষ্ট জটিল। কারণ আবর্তনকারীর চৌম্বক ক্ষেত্রের অক্ষ তার আবর্তনের অক্ষ থেকে আলাদা। প্লাজমা প্রবাহ নেমে আসে আবর্তনকারীর বিষুব থেকে এবং অতিশক্তিশালী বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গ বিকিরিত হতে থাকে।

এই শক্তি নিঃসরণের ফলে ক্রমশ কোয়াসারের শক্তি ফুরিয়ে আসতে থাকে, সে ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ে, তারপর নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের সাথে সাথে তার ঘটে অবসান। কোয়াসারের বস্তু ছড়িয়ে পড়ে সারা গ্যালাক্সি জুড়ে।

কিন্তু বিষয়টি এখানেই শেষ হয় না। যেখানে তার শেষ, সেখান থেকেই আবার হয় তার শুরু। আবার শুরু হয়—তার পূর্ব কার্যক্রম। শুরু হয় সেই দশ কোটি বর্ষব্যাপী কোয়াসার নির্মাণকাল। সমস্ত প্রক্রিয়াটি ঘটতে থাকে আবার নতুন করে।

এই হলো মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়কর খেলা। এ খেলার শেষ নেই। শুরুও নেই। আসলে কি যে বিস্ময়কর খেলা তার হদিস বিজ্ঞানীরা আজো পাননি। যতটুকু জানতে পেরেছেন, তা এই বিশাল বিশ্বের অনন্ত রহস্যের এক বিন্দু মাত্র। তাই এই জানাই শেষ জানা নয়। এই কথাই শেষ কথাও নয়।

বিজ্ঞান যত উন্নত হচ্ছে, বিশ্বের রহস্য ততই আরো রহস্যময় হয়ে নতুন নতুন ভাবে ধরা পড়ছে মানুষের কাছে। কখনো পাল্টে যাচ্ছে গতকালের জানা। হয়তো আজকের জানাও বদলে যাবে আগামীকাল। এমনি করেই চলতে থাকবে অনন্ত কাল।

আগস্ট, ১৯৮৫

নীল আকাশে লক্ষ তারার মেলা

রাতের তারাকাখচিত আকাশটাকে কতো সুন্দর বলেই না মনে হয়। এক ফালি কালো আকাশের বুকে হাজার হাজার তারা, সারারাত ধরে মিটমিট করে জ্বলছে। সত্যি সে এক নয়ন ভুলানো দৃশ্য। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

আর সেই তাকিয়ে থাকতে থাকতেই হাজারো প্রশ্নও এসে মনের মাঝে ভিড় করে দাঁড়ায়—এই তারাগুলো আসলে কি? আর ওরা অমন করে আকাশের গায়ে আটকেই বা আছে কেমন করে?

সেকথা ভাবতে গেলেই মন বিস্ময়ে ভরে ওঠে! বলতে গেলে মহাজগতের বিচিত্র রহস্যের সত্যি সে এক মহাবিস্ময়।

আমাদের এই আকাশের হাজারো তারার মাঝে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় যেনো একটি সাদা মেঘ আকাশের এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। ওটা আসলে মেঘ নয়।

বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন নীহারিকা (Galaxy). আজ থেকে কোটি কোটি বছর আগে মহাজগৎ সৃষ্টির আদিতে প্রকাণ্ড একটি ভাসমান বস্তুপিণ্ড ফেটে গিয়েই (যাকে বলা হয় মহাবিস্ফোরণ বা Big Bang Exploison) নীহারিকাগুলোর জন্ম হয়েছে।

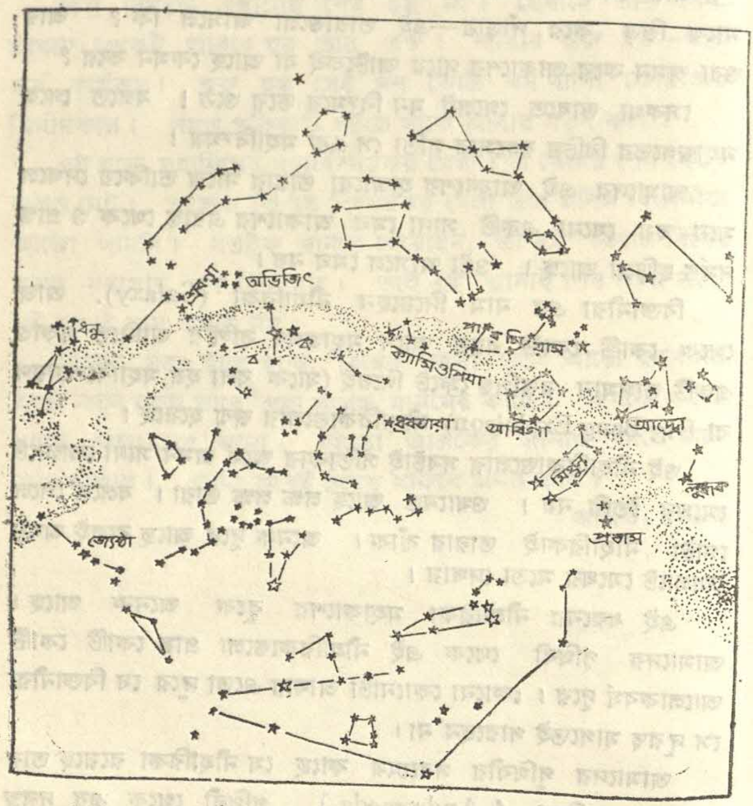
ওই নীহারিকাগুলোর সবটাই সত্যিকার অর্থে অমন সাদা ঘোলাটে মেঘের তৈরি নয়। ওখানেও আছে লক্ষ লক্ষ তারা। বলতে গেলে গোটা নীহারিকাই তারার ঝাঁক। অনেক দূরে আছে বলেই অমন ঘোলাটে মেঘের মতো দেখায়।

এই ধরনের নীহারিকা মহাকাশের বুকে অনেক আছে। আমাদের পৃথিবী থেকে এই নীহারিকাগুলো প্রায় কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে। কোনো কোনোটা আবার এতো দূরে যে বিজ্ঞানীরা সে দূরত্ব মাপতেই পারছেন না।

আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে যে নীহারিকা রয়েছে তার নাম—এন্ড্রোমিডা (Andromeda). পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব হলো—২'২ মিলিয়ন আলোকবর্ষ।

আমরা যে নীহারিকার বাসিন্দা তার নাম ছায়াপথ (Milky Way). যাকে আমরা রাতের বেলায় সাদা মেঘের মতো আকাশের এপার ওপার পর্যন্ত বিস্তৃত দেখি। আমাদের পৃথিবী, সূর্য এমনকি গোটা সৌর জগতটাই এর অংশ বিশেষ।

তাই বলতে হয়—সূর্যিমামা আমাদের কাছে যতো পালোয়ান-গিরিই দেখাক না কেনো, সেও কিন্তু ছায়াপথের ওই কোটি কোটি তারারই একটি মাত্র। তাও মাঝারি সাইজের একটি তারা। নেহাৎ সূর্য আমাদের কাছে বলেই তাকে অতো বিরাট বলে মনে হয়। নইলে সূর্যি মামার মতো অমন তেজওয়ালা তারা আকাশে ঢের আছে।



আকাশে দৃশ্যমান উল্লেখযোগ্য নক্ষত্রসমূহের অবস্থান। আকাশের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত ঘনবিন্দুর যে চিহ্ন ওটা ছায়াপথ।

তবু তো আমরা খালি চোখে সব তারা দেখতেই পাইনে। আমরা খালি চোখে আকাশে যতো তারা দেখি তা সত্যিকার সংখ্যার কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র।

।। ২ ।।

খালি চোখে মানুষ খুব সামান্য সংখ্যক তারাই দেখতে পায়। অনেক দিন আগে ইউরোপীয় জ্যোতিবিজ্ঞানী মিঃ অর্গেলন্দর সাহেব বারবার গণনা করে মাত্র তিন হাজার দু'শ' ছাপ্পান্নটি তারা দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্যারিস থেকে মিঃ হুয়োল্টের সাহেব দেখেছিলেন ৪,১৪৬টি। অর্থাৎ বড় জোর খালি চোখে পাঁচ কি ছ' হাজার তারা দেখা সম্ভব।

এরপর দূরবীন দিয়ে যিনি সর্বপ্রথম তারা গণনার কাজ শুরু করেন তিনি হলেন স্যার উইলিয়াম হার্শেল। তিনি এই তারা গণনার সুবিধার জন্য গোটা আকাশকে কয়েকটি খণ্ডে ভাগ করে নিয়েছিলেন। তিনি প্রায় ৩,৪০০ বার চেষ্টার ফলে গোটা আকাশের দৃশ্যমান তারার ২৫০ ভাগের এক ভাগ মাত্র গুণতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এই সামান্য অংশেই তিনি প্রায় ১ লাখ তারা গুণতে পেরেছিলেন।

স্যার উইলিয়াম হার্শেলের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে স্যার জন হার্শেলও পিতার অনুকরণে তারা গণনার কাজে লেগে যান। তিনি অনেক পরিশ্রম করে ২,৩০০ বার চেষ্টার ফলে প্রায় ৭০,০০০টি তারা গণনা করতে সক্ষম হন।

এরপর মিঃ স্ত্রুব নামে আরেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী অনুমান করেন যে—হয়তো গোটা আকাশ মণ্ডলে প্রায় দু'কোটি তারা আছে। মিঃ মসুর শাকোর্ণক নামে আর এক বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম হার্শেলের গণনার প্রদ্ধতি বিচার-বিশ্লেষণ করে স্থির করেন যে, হয়তো আকাশে সাত কোটি সত্তুর লক্ষ তারা আছে।

অতি সম্প্রতি এ নিয়ে আরো অনেক গবেষণা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা দূরবীন দিয়ে প্রায় দশ কোটি তারা দেখতে সক্ষম হয়েছেন। এরপর আর দেখা যায় না। তবে খুব শক্তিশালী

দূরবীন ক্যামেরা লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা প্রায় ১০০ কোটি তারার ছবি তুলতে পেরেছেন।

কিন্তু বিজ্ঞানীদের ধারণা—এখানেই শেষ নয়—মহাকাশে আরো কতো হাজার হাজার কোটি তারা আছে তা কে জানে ?

প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আকাশের তারাগুলোর আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে বেশ কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। এর ১ম শ্রেণীতে-২০, দ্বিতীয় শ্রেণীতে-৬৫, ৩য় শ্রেণীতে-২০০, ৪র্থ শ্রেণীতে-৫১৫, ৫ম শ্রেণীতে-১,১০০, ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে-৩,২০০, ৭ম শ্রেণীতে-১৩,০০০, ৮ম শ্রেণীতে-৪০,০০০, এবং ৯ম শ্রেণীতে-১,৪২,০০০ তারা আছে।

শুধু প্রাচীন জোতির্বিজ্ঞানীরা নয়—আধুনিক কালের বিজ্ঞানীরাও আকাশে তারার আকৃতি এবং উজ্জ্বলতা অনুসারে তারাদের শ্রেণী বিভাগ করেছেন। যেমন—যেসকল তারার উজ্জ্বলতা বেশী তাদেরকে ধরা হয়েছে প্রথম মাত্রার তারা হিসেবে। যাদের উজ্জ্বলতা অপেক্ষাকৃত একটু কম তাদের ফেলা হয় দ্বিতীয় মাত্রার গ্রুপে। এভাবে পর পর তেইশটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই তেইশতম মাত্রার তারাগুলোর উজ্জ্বলতা এতই ক্ষীণ যে তাদেরকে দূরবীন দিয়েও ভালো করে দেখা যায় না। তবে খালি চোখে ছয় মাত্রা পর্যন্ত তারা দেখা যায়।

আমাদের সূর্য হলো একমাত্রার মানের তারা। আকাশে আরো একটি একমাত্রার মানের তারা হলো লুব্ধক—যার ইংরেজী নাম সিরিয়াস (Sirius).

কিন্তু এইভাবে তারার শ্রেণীবিভাগ করাটাও বিজ্ঞানসম্মত নয়। তাই বিজ্ঞানীরা এই সূত্রেরও কিছুটা সংশোধন করেছেন।

কারণ আকাশে কোনো তারারই উজ্জ্বলতা আসলে কম নয়। যেটি যত দূরে আছে তাকে তত ছোটো দেখায়। কাছেরটি বড় দেখায়। তার আলোও বেশি।

এই জন্যই বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে তারাগুলো কম পক্ষে ৩৩ আলেক বর্ষ দূরে থাকলে যে উজ্জ্বলতা হতো—এই কল্পনা ধরে তাদের মান ঠিক করেছেন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে আমাদের সূর্য

কিন্তু অনেক পেছনে পড়ে যায়। সে হিসেবে সূর্যের মান হয় ষষ্ঠতম।

বিজ্ঞানীরা আকাশের তারাদেরকে আরো এক পদ্ধতিতে শ্রেণী বিভাগ করেছেন। এই পদ্ধতি হলো উত্তাপের দিক দিয়ে মাত্রা নির্ণয়। যেমন—আকাশে যে সমস্ত তারার গায়ের উত্তাপ সবচেয়ে বেশী অর্থাৎ যেসকল তারার উত্তাপ আটাশ হাজার থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড—সেগুলো হলো ইংরেজী O শ্রেণীভুক্ত তারা। আর যেগুলোর তাপমাত্রা সবচেয়ে কম অর্থাৎ যাদের তাপমাত্রা দুহাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের নীচে সেগুলো হলো ইংরেজী এন (N) শ্রেণীভুক্ত। এমনি করে O থেকে পর পর B, A, F, G, K, M, N, নাম দেয়া হয়েছে। এ হিসেবে আমাদের সূর্য হলো G শ্রেণীভুক্ত তারা। কারণ সূর্যের বাইরের দিকের তাপমাত্রা ছয় হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

॥ ৩ ॥

আকাশে যে শুধু লাখো লাখো, কোটি কোটি তারা আছে তা-ই নয়। নানা জাতের তারাও আছে। যেমন—বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত প্রায় ২৫ হাজার তারা আবিষ্কার করেছেন। এই তারাগুলো একা নয়, এদের প্রত্যেকের একটি করে সাথী আছে। এই জন্যই এদেরকে বলা হয়—যুগ্মতারা (Binary Star)।

এই জোড়া তারাদের কোনো কোনোটি আবার একদম জোড় লেগে নেই। কাছাকাছি অবস্থিত মাত্র। এরা কাছাকাছি থেকে পরস্পরকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। এ জন্যই মাঝে মাঝে একটি তারা ঘুরতে ঘুরতে অপরটির আড়ালে চলে যায়। তখন এদের দেখাই যায় না। আবার যখন পাশাপাশি চলে আসে তখন বেশ উজ্জ্বল দেখায়। এই তারাগুলোকে বলা হয় অশান্ত তারা (Variable Star). উজ্জ্বল কিন্তু যেসব জোড়া তারা স্থির হয়ে থাকে তাদের নাম দেয়া হয়েছে শান্ত তারা (Fixed Star)

মহাকাশে লীরা (Lyra) হলো একটি অশান্ত জোড়া তারা। এখানে আছে আসলে দু'জোড়া জোড়া তারা (Double Binary). এরা এক জোড়া অপর জোড়াকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে।

আর স্থির তারাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো মীরা (Mira) তারাটি। এটি আসলে একটি তারামণ্ডল। পাঁচটি তারার সমষ্টি। দক্ষিণ আকাশে এটিকে দেখা যায়। এর আলো বেশ উজ্জ্বল।

আকাশের প্রায় সব তারাই একটা না একটা ঝাঁক বেঁধে থাকে। এই তারার ঝাঁক বা দলকে বলে তারকামণ্ডল। যেমন—সপ্তর্ষি মণ্ডল, লঘু সপ্তর্ষি। এই লঘু সপ্তর্ষি মণ্ডলের মধ্যেই আছে ধ্রুবতারা। যাদের কথা আগেই বলেছি।

আকাশের সব তারার আলোই মিটমিট করে জ্বলে। কিন্তু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে—আকাশে গোটা কয়েক তারা আছে যাদের আলো মিট মিট করে না। আলোটা একেবারে স্থির হয়ে জ্বলছে সর্বক্ষণ।

আসলে এগুলো তারাই নয়। এগুলো হলো আমাদের সৌর জগতের এক একটি গ্রহ। যেমন—সন্ধ্যারাতের আকাশে স্থির আলো বিশিষ্ট যে তারাটি আমরা দেখি ওটা আসলে শুক্রগ্রহ।

এদের কোনো নিজস্ব আলোও নেই—অন্য তারাদের যেমন আছে। চাঁদের মতো এরাও সূর্যের আলোতে আলোকিত।

অন্যান্য তারার তো নিজস্ব আলো আছে। সেই আলো কোটি কোটি কিলোমিটার পথ বেয়ে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসে। মহাকাশের বাতাসের মধ্য দিয়ে আলো আসতে হয় বলেই এদের আলোর রেখা কাঁপে আর এটাকেই আমরা মিটমিট করতে দেখি।

॥ ৪ ॥

মহাকাশের সব তারাই প্রায় কোটি কোটি বছর ধরে একইভাবে জ্বলছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো কোনো তারা আছে যারা জ্বলতে জ্বলতেই হঠাৎ এক সময় নিভে যায়। বহুদিন পর্যন্ত তাদের কোনো খোঁজ খবরই পাওয়া যায় না। হঠাৎ করে দেখা গেলো তারাটি আবার জ্বলতে শুরু করেছে। কিংবা কোনো কোনো সময় দেখা গেলো মহাকাশের যেখানে কোনো তারা থাকার কথা নয় বা ছিলোও না, সেখানেই একটা নতুন তারার জন্ম হয়েছে।

কেনো এমন হচ্ছে বিজ্ঞানীরা তার কারণ অনুসন্ধান করেছেন। বিজ্ঞানীরা বলেন,—ক্রমে ক্রমে কোনো তারা তার নিজস্ব আলো হারিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এলেও তার ভিতরে তখনো থাকে প্রচণ্ড গরম। যেমন—আমাদের এই সুজলা সুফলা শীতল পৃথিবীটার অভ্যন্তর ভাগ এখনো প্রচণ্ড গরম।

সুতরাং ওই নিবে যাওয়া তারার ভিতরকার গরমই হঠাৎ করে হয়তো প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটায়। আর তার ফলেই আগুন ধরে যায়। সেই আলোই আমরা দেখতে পাই।

এই তারা নিভে গেলেও কিন্তু তার চলার গতি থেমে যায় না। তখনো সে প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে থাকে। আর এই ছুটতে ছুটতেই হয়তো সে আর একটি নিবে যাওয়া তারার সাথে ধাক্কা খায়। আর তার ফলেই আগুন জ্বলে উঠে। সে যে সত্যি সত্যি কী ভয়ানক কাণ্ডকারখানা তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনে।

।। ৫ ।।

এই যে তারা নিবে যাওয়ার কথা বললাম। এই কাণ্ডটিও কিন্তু একদিনে ঘটেনা। ঘটে ধীরে ধীরে। বহু হাজার হাজার বছর ধরে।

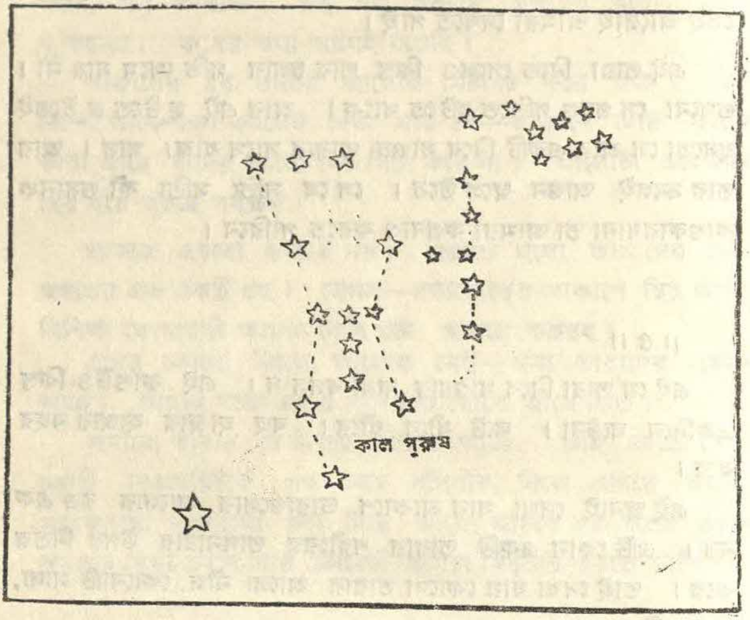
এই জন্যই দেখা যায় আকাশে তারাগুলোর আলোর রঙ এক নয়। এটি কোন একটি তারার শরীরের তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। তাই দেখা যায় কোনো তারার আলো নীল, কোনোটি সাদা, কোনোটি বা লালচে।

যে তারাগুলো বয়সে নবীন তাদের গায়ে ভীষণ তাপ আছে, সেগুলোর আলো হয় নীল। আর যাদের বয়স বেশি অর্থাৎ আলো দিতে দিতে আয়ু খানিকটা কমে এসেছে তাদেরই আলো হয় লালচে।

আমি আগেই বলেছি, আকাশের সব তারাই প্রায় একটি না একটি দলে বা ঝাঁকে থাকে। আর এই তারার ঝাঁককেই বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন নক্ষত্র মণ্ডল। মহাকাশে অসংখ্য নক্ষত্র মণ্ডল আছে। তবে এর মধ্য থেকে বিজ্ঞানীরা বিশেষ বিশেষ কয়েকটি নক্ষত্র

মণ্ডলকে চিহ্নিত করেছেন এবং তাদের সুন্দর সুন্দর নামকরণও করেছেন।

আকাশের সবচেয়ে নামজাদা নক্ষত্র মণ্ডলটির নাম হলো কাল-পুরুষ। এই নক্ষত্র মণ্ডলের নক্ষত্রগুলোকে রেখা টেনে দিলে অবিকল ঠিক মানুষের আকার হয়। ইংরেজরা এর নাম দিয়েছে ওরায়ন। গ্রীক



আকাশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নক্ষত্রমণ্ডল কালপুরুষ।

পুরানের মস্তবড় শিকারী দেবতা ওরায়নের নাম অনুসারেই এর নাম রাখা হয়েছে। এর হাতে একটি ধনুকও আছে। কোমরে আছে কোমর ধন্ধ। তাতে ঝুলছে তলোয়ার।

এই কাল পুরুষকে শীতের রাতে দেখা যায় আকাশের পূর্বদিকে। তারপরই এটি ক্রমশ পশ্চিম দিকে সরতে থাকে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এটিকে দেখা যায় পশ্চিম আকাশে।

চৈত্র বৈশাখ মাসে আরেকটি নক্ষত্র মণ্ডল আকাশের উপরে সামান্য উত্তর দিকে দেখা যায়। এর নাম হলো সপ্তর্ষি মণ্ডল। এর ইউরোপীয় নাম হলো—Ursa Major, আর ইংরেজী নাম হলো—great Bear বা বড় ভালুক।

হিন্দুদের পুরাণশাস্ত্রে এই সাতটি তারার সুন্দর সুন্দর নাম আছে। সাতজন বিখ্যাত প্রাচীন বৈদিক ঋষির নাম অনুসারে এদের নাম রাখা হয়েছে। যেমন—বশিষ্ট, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, এবং ক্রতু।

সপ্তর্ষি বা সাত ঋষিদের পাশেই আরো একটি ছোটো তারা আছে। এর নাম হলো অরুন্ধতী। অরুন্ধতী হলেন বশিষ্টের স্ত্রী। তাই স্বামীর পাশেই তার স্থান। কিন্তু এই অরুন্ধতীর উজ্জ্বলতা খুব কম। যাদের দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ তারা এটিকে দেখতেই পায় না।

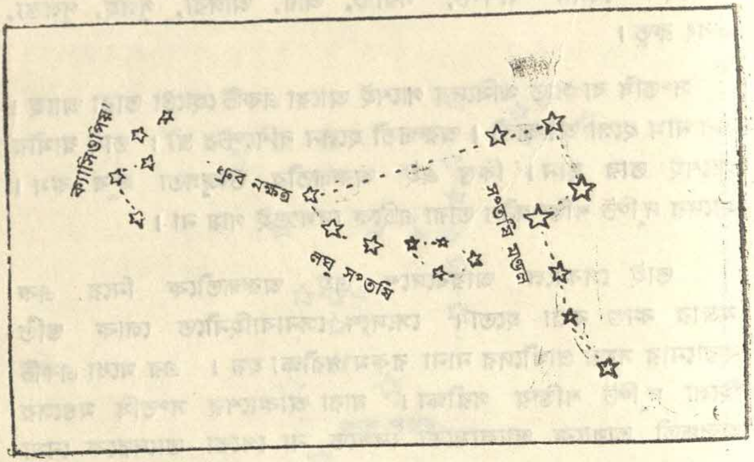
তাই সেকালে আরবদেশে এই অরুন্ধতীকে নিয়ে এক মজার কাণ্ড করা হতো। সেদেশে সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তি করানোর সময় প্রার্থীদের নানা রকম পরীক্ষা হয়। এর মধ্যে একটি ছিলো দৃষ্টি শক্তির পরীক্ষা। যারা আকাশের সপ্তর্ষি মণ্ডলের অরুন্ধতী তারাকে ভালোমতো দেখতে না পেতো তাদেরকে নেয়া হতো না। কারণ তাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ বলে ধরা হতো।

এই সপ্তর্ষি মণ্ডল নিয়ে গ্রীক পুরাণেও একটি মজার গল্প আছে। সপ্তর্ষি মণ্ডলের যে তারাগুলো আছে সেগুলোকে রেখা দিয়ে টানলে নাকি একটি ভালুকের আকার হয়। তাই সপ্তর্ষি মণ্ডলের ইংরেজী নাম গ্রেট বিয়ার বা বড় ভালুক। গল্পটিও এই বড় ভালুকটিকে নিয়েই।

স্বর্গে ছিলো এক পরমাসুন্দরী কন্যা। নাম ছিলো তার ক্যালিস্টো। এমন সুন্দরী মেয়ে সাত ভুবনে কোথাও নেই।

এই সুন্দরী কন্যাটিকে দেবরাজ জিউস খুব আদর করতেন। কিন্তু দেবরাজের এই আদর করাকে রাণী মোটেই সুনজরে দেখতেন না। রাণী ক্যালিস্টোকে খুব হিংসে করতেন।

দেবরাজ দেখলেন—এতো ভারী বিপদ। রাণী যদি সত্যি সত্যি নিরীহ মেয়েটির কোনো ক্ষতি করে ফেলে। তাই মেয়েটিকে রক্ষা করার জন্য দেবরাজ এক বুদ্ধি বের করলেন। তিনি মন্ত্র বলে মেয়েটিকে একটি মস্ত বড় তারার ভালুক বানিয়ে বসিয়ে দিলেন আকাশে। আর সেই থেকেই সে আকাশে আছে তারা হয়ে।



আকাশের তিনটি বিশিষ্ট নক্ষত্রমণ্ডল—ক্যাসিওপিয়া, লঘু সপ্তর্ষি ও সপ্তর্ষিমণ্ডল।

এদিকে ক্যালিস্টোর একটি ছেলেও ছিলো। ছেলেটির নাম আর্কাস। দেবরাজ ভাবলেন ক্যালিস্টোর ছেলেকে কোথায় রাখা যায় তাহলে? তাই অবশেষে তাকেও ভালুক বানিয়ে বসিয়ে দিলেন মায়ের পাশেই। সেই থেকে মা আর ছেলে একসাথেই আকাশে তারা হয়ে আছে।

এই ভালুক ছানাটির নাম হলো ছোট ভালুক বা লিটল বিয়ার। বাংলায় যার নাম লঘুসপ্তর্ষি।

সপ্তর্ষি মণ্ডলের তারাগুলোকে রেখা দিয়ে টানলে আসলে ঠিক একটি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো দেখায়।

এই সপ্তর্ষি মণ্ডলের কাছেই একটি উজ্জ্বল তারা আছে। এটিই হলো আকাশের সব চাইতে বিখ্যাত তারা। এর নাম ধ্রুবতারা। হিন্দুদের পুরাণের রাজা উত্তানপাদের পুত্র এবং মস্তবড় ঋষি ধ্রুবের নাম অনুসারে এর নাম রাখা হয়েছে। অবশ্য ধ্রুব শব্দের ভিন্ন একটি অর্থও আছে। ধ্রুব মানে স্থির বা অচল। অর্থাৎ আকাশের এই তারাটি কখনো নড়াচড়া করে না। সর্বক্ষণ অচল থাকে। এজন্য এটিকে বলা হয় ধ্রুবতারা বা স্থির তারা।

কিন্তু সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এই ধ্রুবতারার অচলতা সম্পর্কে একটু ভিন্নরকম তথ্য দিয়েছেন। অর্থাৎ এই ধ্রুবতারা নাকি সত্যি সত্যি ধ্রুব বা স্থির নয়।

এই ধ্রুব তারাটি এখন যেখানে আছে পাঁচ হাজার বছর আগেও নাকি এখানে ছিলো না। তাই এটার নাম তখন ধ্রুবতারা ছিলো না। তখন ধ্রুবতারা ছিলো এরই কাছাকাছি অন্য একটি তারা। তার আসল নাম "থুবান"। এই থুবান এখন আর ধ্রুবতারা নেই। এর বর্তমান অবস্থান হচ্ছে সপ্তর্ষি মণ্ডল এবং লঘু সপ্তর্ষি মণ্ডলের মাঝামাঝি স্থানে।

বর্তমানে এখন যে তারাটি ধ্রুবতারা নামের অধিকারী আগামী হাজার কয়েক বছর পরে এটিও আর তা থাকবে না। এরপর যে তারাটি ধ্রুব তারার আসন গ্রহণ করবে তার বর্তমান নাম 'ভেগা স্টার (Vega Star)। বাংলায় যার নাম অভিজিত নক্ষত্র।

এই সপ্তর্ষি মণ্ডলের মতোই আকাশে আরো একটি নক্ষত্র মণ্ডল আছে। এর নাম দেয়া হয়েছে—ছোটো ভালুক (Ursa Minor বা Little Bear). এদেশীয় নাম লঘু সপ্তর্ষি। যার কথা একটু আগেই গ্রীক পুরাণের গল্পে বললাম।

এটিও দেখতে অনেকটা সপ্তর্ষি মণ্ডলের মতোই—তবে আকৃতিতে অপেক্ষাকৃত ছোটো। এই লঘু সপ্তর্ষিরই শেষ তারা হলো ধ্রুবতারা

এই ধ্রুবতারা থেকে দূরে আরো একটি পরিচিত নক্ষত্র মণ্ডল রয়েছে। দেখতে অনেকটা ইংরেজী ডব্লিউ-এর মতো। গ্রীকরা

এর নাম দিয়েছেন—ক্যাসিওপীয়া (Cassiopeia). শীত কালে একে উত্তর আকাশে দেখা যায়।

এই ক্যাসিওপীয়ার ঠিক কাছেই রয়েছে আরো দুটি নক্ষত্র। এর একটির নাম হলো সিফিউস নক্ষত্র (Cepheus) এবং অপরটির নাম পার্সিয়ুস (Perseus)

॥ ৬ ॥

এমনি আরো অনেক তারা আছে আকাশে। এর মধ্যে যেগুলো বেশী উল্লেখযোগ্য তার মধ্যে কয়েকটির নাম এবং পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব কত তার একটি হিসেব দেখানো হলো—

তারার নাম			পৃথিবী থেকে দূরত্ব
Proxima Centauri	...	...	৪.২৮ আলোক বর্ষ
Rigil Kent (বানরাজা)	...	...	৪·৩৭ ,, ,,
Centauri-Alpha (কিন্নর)	...	...	৪·৩৭ ,, ,,
Centauri-Beta	...	...	৪·৩৭ ,, ,,
Barnard's star	...	...	৫·৯০ ,, ,,
Wolf—359	...	...	৭·৬০ ,, ,,
Lalande—21185	...	...	৮·৯০ ,, ,,
Sirius—Alpha (লুব্ধক)	...	...	৮·৮০ ,, ,,
Sirius—Beta	...	...	৮·৮০ ,, ,,
Luyten—726-8A	...	...	৮·৮৮ ,, ,,
UV—Ceti	...	...	৮·৮৮ ,, ,,
Ross—154	...	...	৯·৪৪ ,, ,,
Ross—214	...	...	১০·২৮ ,, ,,
Procyon (সরমা)	...	...	১১·৪০ ,, ,,
Altair (শ্রবণা)	...	...	১৬·০০ ,, ,,
Vega (অভিজিত)	...	...	২৬·০০ ,, ,,
Arcturus (স্বাতী)	...	...	৩৭·০০ ,, ,,
Capella (ব্রহ্ম হৃদয়)	...	...	৪৬·০০ ,, ,,

তারার নাম			পৃথিবী থেকে দূরত্ব
Achernar (শুভ্র তারা)	...	...	১২৭'০০ আলোক বর্ষ
Canopus (অগস্ত্য)	...	...	১৯৬'০০ ,, ,,
Hadar	...	...	৩৯১'০০ ,, ,,
Betalgeuse (আর্দ্রা)	...	...	৫৫২'০০ ,, ,,
Rigel	...	...	৮৯৫'০০ ,, ,,

এছাড়াও আকাশে আরো জানা অজানা কোটি কোটি তারা আছে। এই তারা নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার আজো শেষ নেই।

জানুয়ারী, ১৯৭৫

তারার জন্ম আছে মৃত্যু আছে

এই যে অনন্ত আকাশের কোটি কোটি তারার কথা বললাম, এগুলোর কেমন করে জন্ম হলো ? কেমন করে এরা রূপ নিলো ? তা নিয়েও বিজ্ঞানীরা করেছেন নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা।

বিজ্ঞানীদের অভিমত এই যে, ওই মহাবিস্ফোরণের ফলে অনন্ত আকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়া মেঘ রাশি (Cloud of Matter) জমাট বেঁধে বেঁধেই জন্ম হয়েছে এক একটি তারার। এই ধুলো বা মেঘকে বলা হয় নীহারিকা (Nebula). মহাকাশের এক এক স্থানের মেঘরাশি তাদের পারস্পারিক আকর্ষনের ফলে কোনো কোনো সময় প্রথমে ঘনীভূত হয়ে এসেছে। এমনি করে রূপ নিয়েছে একটি হালকা গোলাকার বস্তুর। এটাই তারার জন্মের প্রাথমিক স্তর। কিন্তু তারপরই শেষ নয়। এই ঘনীভূত গোলাকার মেঘরাশি নিজেদের মধ্যকার আকর্ষণের ফলে ক্রমে আরো সংকুচিত হতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই গোলাকার বস্তুটির ভিতরে প্রচণ্ডতম চাপ সৃষ্টি হয়ে পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে (Nuclear Reactions)। আর এই সময়েই এর শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হতে থাকে উজ্জ্বল এবং প্রচণ্ড আলোকচ্ছটা। এমনি করেই মহাকাশের বুকে জন্ম নেয় এক একটি নতুন তারার।

তারার জন্মের শুরুতে মহাকাশের ধুলোরাশির ঘনিভূত হওয়ার সময় কি রকম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় বিজ্ঞানীরা তারও কিছু বিশ্লেষণ দিয়েছেন।

মহাবিস্ফোরণের পর থেকে মহাকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে মহাজাগতিক ধুলোরাশির পরমাণুর কণিকাসমূহ। এই পরমাণুর অতি ক্ষুদ্র অণু কণিকাগুলো কেমন করে ক্রমে কেন্দ্রীভূত হয় তা সত্যি এক রহস্যময় ব্যাপার। অথচ এই অতিক্ষুদ্র অণুকণিকা গুলোই মহাজাগতিক ধুলিকণা তথা সারা বিশ্বের সকল

বস্তুর আবিষ্কার। রেডিও টেলিস্কোপের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এই অণুকণিকাগুলোর অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন।

এই অণুকণিকাগুলোর একটি হলো প্রোটন (Proton)-যার আছে ধনাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জ। অপরটি হলো ইলেকট্রন (Electron)—যার আছে ঋণাত্মক চার্জ। এরা একে অপরকে আকর্ষণ করে। পরস্পরে মিলিত হয়ে ইলেকট্রন ঘুরতে থাকে প্রোটনকে ঘিরে। আর এভাবেই একটি প্রোটন আর একটি ইলেকট্রন মিলে সৃষ্টি হয় অন্য একটি অতি সাধারণ বস্তু। এই অতি সাধারণ বস্তুটির নাম হলো হাইড্রোজেন পরমাণু (Hydrogen Atom).

এর শেষ বলে কিছু নেই। এ এক পরম বিস্ময়! একটি যোগ আর একটি বিয়োগ। ঘিরে আছে পরস্পর পরস্পরকে। অথচ এরাই হলো সারা বিশ্বের সমস্ত কিছু মূল।

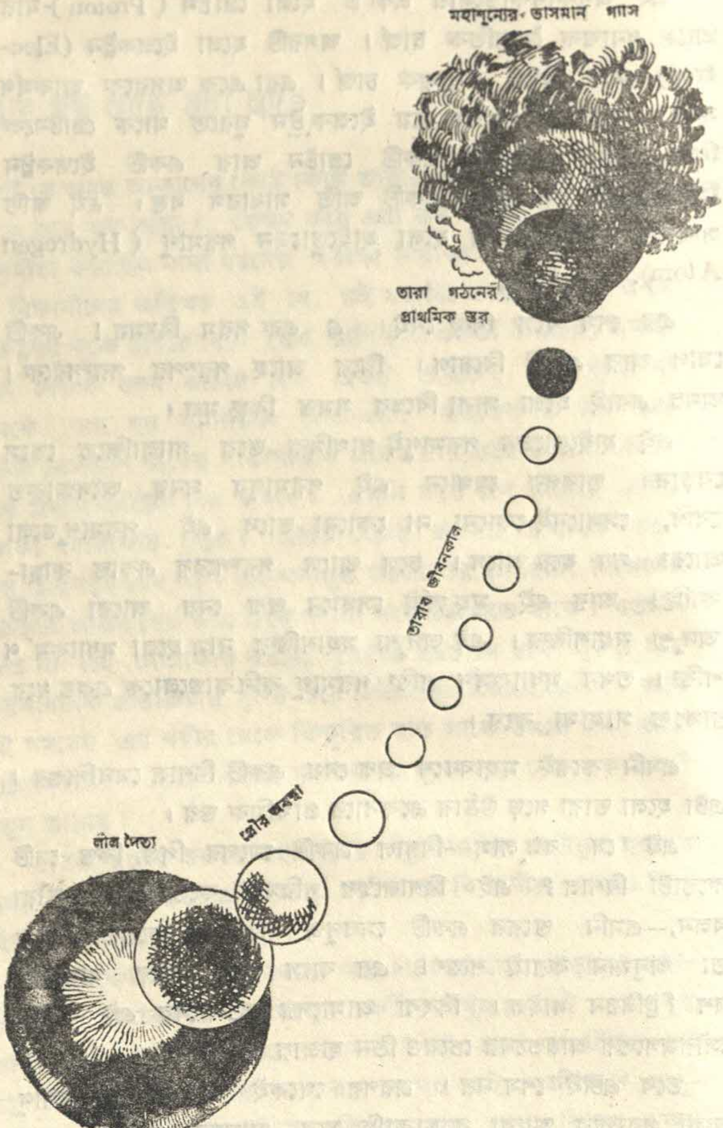
এই হাইড্রোজেন পরমাণুই প্রাথমিক স্তরে গ্যালাক্সিতে ভেসে বেড়ায়। তারপর যেখানে এই পরমাণুর ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি, সেখানেই-কোনো না কোনো ভাবে এই পরমাণুগুলো আরো ঘন হয়ে আসে। চলে আসে পরস্পরের একান্ত কাছাকাছি। আর এই মুহূর্তেই সেখানে জন্ম নেয় আরো একটি অদৃশ্য মহাশক্তির। এই অদৃশ্য মহাশক্তির নাম হলো মধ্যাকর্ষণ শক্তি। তখন মধ্যাকর্ষণ শক্তি পরমাণু কণিকাগুলোকে একত্র ধরে রাখতে সাহায্য করে।

এমনি করেই মহাকাশে জন্ম নেয় একটি বিশাল মেঘপিণ্ডের। এটা হলো তারা গড়ে উঠার একেবারে প্রাথমিক স্তর।

এই যে বললাম—বিশাল একটি মেঘের পিণ্ড, কিন্তু সেটি কতোটা বিশাল? এই বিশালত্বের পরিমাপ কতো? বিজ্ঞানীরা বলন,—এমনি স্তরের একটি মেঘপুঞ্জ সত্যি যে কতো বিশাল তা অনুমান করাই শাক্ত। এর ব্যাস হতে পারে কমপক্ষে দশ ট্রিলিয়ন মাইল। কিংবা আমাদের বর্তমানের এই গোটা সৌরজগতের আয়তনের চেয়েও তিন হাজার গুণ বেশি।

তবে এটাই শেষ নয়। এরপর থেকেই মেঘপুঞ্জের পরমাণুগুলো পরস্পরে আরো কাছাকাছি সরে আসতে থাকে। আর

তার ফলে বিশাল মেঘপুঞ্জের আয়তনও কমতে থাকে। বাড়তে থাকে ঘনত্ব। রূপ নিতে থাকে একটি শক্তপিণ্ডের।



এরপর থেকে শুরু হয় একটি তারার জন্ম নেয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। মেঘপুঞ্জ যতই ঘন হতে থাকে, ততই এর ভেতরে জন্ম হতে থাকে উত্তাপের। উত্তাপ দ্রুত বাড়তে থাকে। ক্রমে এই উত্তাপ কেন্দ্রের দিকে প্রায় এক লাখ ফারেনহাইট ডিগ্রীতে গিয়ে পেঁছায়।

এই প্রচণ্ডতর তাপে সেখানে ঘটতে থাকে আরো একটি বিস্ময়কর ঘটনা। এই প্রচণ্ড তাপে সেখানকার হাইড্রোজেন পরমাণু-গুলো আবার দ্রুত ভাংতে থাকে। তারা চলে আসে পূর্বের পৃথক ধনাত্মক আর ঋণাত্মক পরিস্থিতিতে।

এই সময় গোলাকার পিণ্ডটি আরো ঘনীভূত এবং ছোটো হয়ে আসতে শুরু করে। এর ব্যাস দাঁড়ায় তখন ১০০ মিলিয়ন মাইলে। পিণ্ডটি তখন দুটো ভিন্নধর্মী গ্যাসের সংমিশ্রণে পরিণত হয়। এর একটি হলো—প্রত্যাবর্তকারী ঋণাত্মক ইলেকট্রন এবং অপরটি হলো-ধনাত্মক প্রোটন। এই অবস্থা চলতে থাকে কম করে হলেও এক কোটি বছর। এই সময় তার তাপও ক্রমে বৃদ্ধি পতে থাকে এবং গোলকের আকৃতি ক্রমাগত ছোট হতে থাকে। শক্ত হতে থাকে।

আর এমনি করে এই পিণ্ডটির ব্যাস এসে দাঁড়ায় দশ লাখ মাইলে আর উত্তাপ গিয়ে দাঁড়ায় দু'কোটি ডিগ্রীতে। আর এই সময়ই গোলকটির পেটের ভিতর শুরু হয় পারমাণবিক যুদ্ধ। প্রোটন এমন বিস্ময়করভাবে ভাংতে থাকে যে সেগুলো ফিউজ হয়ে যায়। আর এমনি করে চারটি প্রোটন পুড়ে জন্ম হয় নতুন একটি পদার্থের। এই নতুন পদার্থটির নাম হলো হিলিয়াম (Hilium) গ্যাস।

উল্লেখ্য যে, যে পদ্ধতিতে নক্ষত্রের বুকে প্রোটন পুড়ে হিলিয়াম গ্যাস তৈরি হয়—অবিকল একই পদ্ধতিতেই হাইড্রোজন বোমাও তৈরি হয়। হাইড্রোজেন বোমার জন্য প্রোটন পোড়ানো হয় ল্যাবরেটরীতে আর নক্ষত্রের বুকে এটা প্রাকৃতিকভাবেই হয়ে থাকে এবং ব্যাপক-ভাবে হয়। যেমন—আমাদের সূর্যের বুকে প্রোটন পুড়ে প্রতি সেকেণ্ডে ৫৫৪ টন হিলিয়াম তৈরি হয়। এই বিপুল পরিমাণ হিলিয়াম ল্যাবরেটরীতে তৈরির কথা কল্পনাও করা যায় না।

আর এমনি করেই মহাকাশে জন্ম হয় একটি নূতন তারার। আয়তন এসে দাঁড়ায় এক মিলিয়ন মাইলে। তখন তারার আকার হয় সঠিক।

কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ নয়। তারার বুকের প্রোটন পোড়ানোর ঘটনা চলতে থাকে অবিরাম। এটাই তার শক্তি, আলো আর তেজের উৎস। আর এটাই তার জীবনও।

একটি তারা তার শরীরের বিপল পরিমাণ হাইড্রোজেন পুড়িয়েই এতো বিস্ময়কর আলোকচ্ছটার সৃষ্টি করে। তারপর এই তারাদের বয়স যখন বেশী হয়ে আসে অর্থাৎ একটি তারা তার জীবনের শেষ প্রান্তরে দিকে যখন এসে পড়ে, তখন তার শরীরের হাইড্রোজেন পুড়তে থাকে আরো অনেক বেশী পরিমাণে।

এই হাইড্রোজেন পূড়ানোর পরিমাণ তখন বেশী মাত্রায় হতে থাকে, তারাটির শরীরের আকৃতি ফুলে ফেঁপে ক্রমশঃ বড় হতে থাকে। এই সময় আলোও ছড়াতে থাকে আগের তুলনায় অনেক বেশী। এই সময় তারাটির আলোর রঙ হয় লাল। আর তারার আকার হয় প্রকাণ্ড। সেই জন্য বিজ্ঞানীরা এই জাতের বুড়ো তারাদের নাম দিয়েছেন লাল দৈত্য (Red Gaint)। মহাকাশের বুকে শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে বিজ্ঞানীরা কোটি কোটি তারার মধ্যে এমন বেশ কিছু পরিমাণ বুড়ো লাল দৈত্যের সন্ধানও পেয়েছেন। এগুলোর আলো কেনো এমন হয়েছে তার অনুসন্ধান করতে গিয়েই বিজ্ঞানীরা ধরতে পেরেছেন তারাদের জন্ম-মৃত্যুর আদি ইতিহাস। বিজ্ঞানীরা এখন এই রহস্যের উন্মোচন করেছেন যে,—এই তারারাও জন্ম গ্রহণ করে, এরাও মৃত্যুবরণ করে। অর্থাৎ প্রাণীদের মতো এদেরও জন্ম মৃত্যু হয়।

মহাকাশের বুকে আর্কচারাস (Arcturus) বলে একটি তারা আছে, এটি হলো এমনি একটি লাল দৈত্য। এটি আমাদের দৃশ্যমান মহাকাশের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল তারা। এটি আমাদের নিকটতম তারা সূর্যের চেয়েও প্রায় ২৫ গুণ বেশি বড় এবং সূর্যের চেয়ে কম করে হলেও একশো গুণ বেশী আলো ছড়ায়।

এই যে আমাদের সৌরমণ্ডলের তারা সূর্য, এটিও একদিন এমনি করে ওদের মতোই বুড়ো হবে। এমনি করে এর বর্তমান আকৃতি ফুলে ফেঁপে বেড়ে গিয়ে অনেক প্রকাণ্ড হয়ে পড়বে। আলো ছড়াবে

হয়তো শত গুণ বেশী। আমাদের সূর্য সত্যিসত্যি একদিন বুড়ো হলে কেমন আকৃতি হবে, ওই মহাকাশের বুড়ো লাল দৈত্য আর্কচারাসই তার দৃষ্টান্ত।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, যেদিন আমাদের সূর্যটা বুড়ো হয়ে লাল দৈত্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে, সেদিনই হয়তো হবে রোজ কেয়ামত। সেদিন সূর্যের প্রচণ্ড আলোতে এর নিকটবর্তী গ্রহগুলো অর্থাৎ বুধ, শুক্র, পৃথিবী সবগুলো ঝলসে যাবে। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

সূর্য নামের আমাদের কাছের এই তারাটিরও কিন্তু এমনি করে একদিন নীহারিকার মেঘপুঞ্জ জমাট বেঁধেই জন্ম হয়েছিলো। এই ঘটনাটি ঘটেছিলো হয়তো আজ থেকে ৪৭০ কোটি বছর আগে। তারপর একদা যখন সূর্যের আয়ু শেষ হয়ে আসবে. সূর্য লাল দৈত্য হবে, তখন এই পৃথিবীর আবহাওয়ায় ঘটবে প্রচণ্ড রকম পরিবর্তন।

মেরু অঞ্চলের সমস্ত জমানো বরফ সেদিন সূর্যের প্রচণ্ড তাপে যাবে গলে। পৃথিবীর উত্তাপ ক্রমশ বাড়তে থাকবে। সাগরের সমস্ত জলরাশি বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। পৃথিবী যাবে শুকিয়ে।

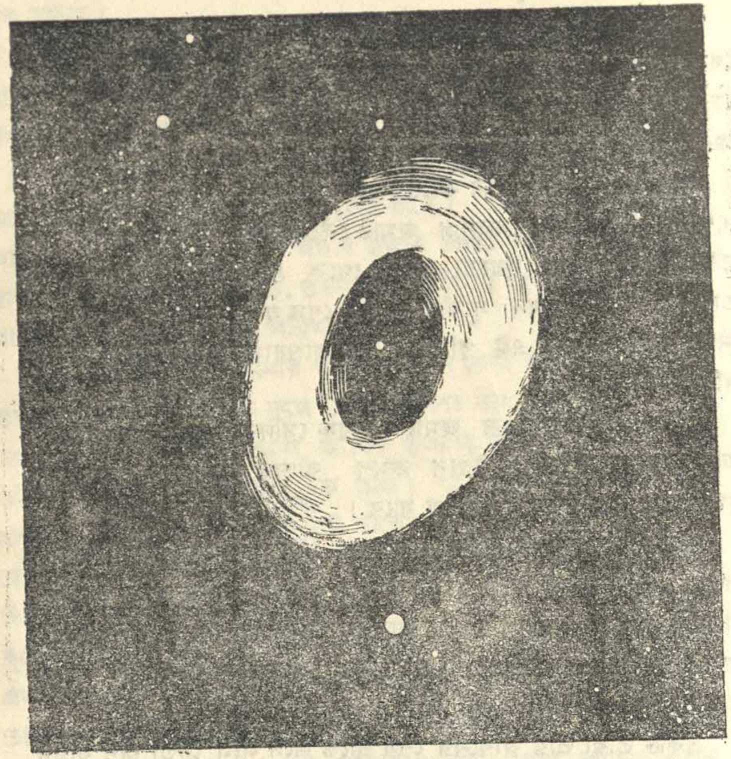
তবে ভরসার কথা এই যে,—তেমন দিন আসতে এখনো অনেক দেরী। বয়স একটু ভাটি ধরছে বটে, তবু সূর্য এখনো বুড়ো হয়নি। লাল দৈত্যের পর্যায়ে পেঁছোতে সূর্যের কমপক্ষে আরো ৫০০ কোটি বছর সময় লাগবে। অতপর দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। পৃথিবী অন্তত আরো পাঁচশো কোটি বছরের জন্য নিরাপদ।

একটি তারা তার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে লাল দৈত্য রূপ ধারণ করবে, কিন্তু এটা কেমন করে হবে তারও ব্যাখা দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

একটি তারা তার শরীরের হাইড্রোজেন পুড়িয়েই আলো ছড়ায়। এভাবে হাইড্রোজেন পোড়াতে পোড়াতে যখন তার বয়স বাড়তে থাকবে, তখন তার হাইড্রোজেনও পুড়বে বেশী মাত্রায়। এমনি করে তার শরীরের উপরের গ্যাস মহাকাশে বিলীন হয়ে যেতে থাকবে।

এটা হবে সুন্দর একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। তারাটির চারপাশে তখন সৃষ্টি হবে এক অদ্ভুত ধরনের উজ্জ্বল লাল আর হলুদ আলোর মালা। এই অলোকমালা একদিকে বাইরে থেকে মহাকাশে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যেতে থাকবে। অপর দিকে তার শরীর ক্ষয় হয়ে

হয়ে চারপাশে আবার জমতে থাকবে লাল-হলুদ আলোকচ্ছটা। এমনি করে তারাটি ক্ষয় পেতে থাকবে ধীরে ধীরে।



ঠিক এমনিভাবে তারার শরীর থেকে ধূয়ার আকারে গ্যাস বের হয়ে যায়। অবশিষ্ট মাঝের ক্ষুদ্র বিন্দুটি সাদাবিন্দু।

ক্ষয় হয়ে যেতে যেতে অবশেষে পড়ে থাকবে শুধু এর ভিতরের একটি অংশ। একটি সাদা শক্ত বল। এটাকেই বলা হয় সাদা বিন্দু (white dwarf)। এই যে সাদা বিন্দুটির কথা বলছি, এটি হলো সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তু।

একটি বুড়ো রেড জায়ান্ট—যার আকৃতি বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, আমাদের সূর্যের চেয়েও কমপক্ষে একশো গুণ বড়। এটি

মৃত্যুর সময় তার ভিতরে সাদাবিন্দু নামের যে কলজেটা ফেলে যাবে তার আকৃতি হবে একেবারেই ক্ষুদ্র।

হয়তো ওই সূর্যের চেয়ে একশো গুণ বড় নক্ষত্রের সাদা কলজেটা হবে সূর্যের চেয়েও একশো গুণ ক্ষুদ্র। আমাদের পৃথিবীর মতোও আকৃতি হতে পারে। কিন্তু তাহলেও ওই সাদা বিন্দুরই কি যে বিস্ময়কর ওজন, তা ভাবতে গেলেও অবাক হতে হয়। ওই ক্ষুদ্র বলটা এতো প্রচণ্ড ঘন পদার্থের তৈরি যে তা বিশ্বাসই করা যায় না। বিজ্ঞানীরা বলেন,—অমনি একটি সাদা বলের এক চামচ পদার্থ কম করে হলেও পৃথিবীর মাটিতে দশ টন কোনো বস্তুর সমান ওজন হবে।

একটি তারার জন্ম থেকে এমনি করে সাদা ক্ষুদ্র বল হয়ে যাওয়াই কিন্তু শেষ নয়। এর পরও তার ক্ষয় অব্যাহতই থাকে। আরো ক্ষয় হতে হতে এক সময় হয়ে যায় অদৃশ্য। একটি দৃশ্যমান তারার হয় জীবনের সমাপ্তি। কিন্তু যেখানে এই তারাটির এমনি করে মৃত্যু হয়, সেখানেই জন্ম নেয় আরো একটি বিস্ময়কর জিনিসের। ওখানেই জন্ম নেয় কালো এক অদৃশ্য দৈত্যের। মানুষ মরে গেলে ভূত হয় কিনা তা জানিনে. কিন্তু তারারা মরে গেলে যে এক একটি তারা এক একটি কালো দৈত্য হয়ে যায়, তার সন্ধান বিজ্ঞানীরাই পেয়েছেন। বিজ্ঞনীরা এর নাম দিয়েছেন কালো গহ্বর (Black Hole). মহাকাশের এই ব্ল্যাক হোল সত্যি এক বিস্ময়কর বস্তু।

একটি তারা কতো বছর বাঁচবে তা নির্ভর করে এটা কতো ঘন পদার্থ দ্বারা তৈরি তার উপর। একটি তারা বড় হলেই যে বেশীদিন বাঁচবে বা ক্ষুদ্র হলেই স্বল্পায়ু হবে, এমন কোনো কথা নেই। যেমন, যে তারাটি আমাদের সূর্যের চেয়ে ক্ষুদ্র তার আয়ুও অনেক দীর্ঘ হতে পারে, আবার যেটা আমাদের সূর্যের চেয়ে অনেকগুণে বড় তার আয়ুও হতে পারে অনেক কম।

যেমন—মহাকাশে সিরিয়াস (Sirius) নামে একটি তারা ছিলো। এটি আমাদের সূর্যের চেয়েও কমপক্ষে দ্বিগুন বড় ছিলো। কিন্তু এটি হয়েছিলো একেবারেই স্বল্পায়ু। এর আয়ু ছিলো মাত্র দশ কোটি বছর। এটি মরে গেছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে মহাকাশ থেকে। অনেকে বলেন,—এটি হয়তো আমাদের সূর্যের সাথেই জন্ম নিয়ে-

ছিলো, কিন্তু সূর্য যৌবন পেরুতে না পেরুতেই সিরিয়াস বুড়ো হয়ে মরে ভূত হয়ে গেছে।

একটি তারা যখন লাল দৈত্যে পরিণত হয়, তখনি তার শরীর থেকে অকস্মাৎ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো ধূম্র রাশি উদ্‌গীরণ হতে থাকে। এই ধূম্র উদ্‌গীরণ হয়ে ধ্বংস হওয়ার অবস্থাকেই বলা হয় সুপারনোভা (Supernova)· এই সময় মাত্র কয়েক সপ্তাহ সময়ের মধ্যে সেই তারাটির উজ্জ্বলতা এতো বেশী বেড়ে যায় যে, তা প্রায় তার জীবনকালের সর্ব মোট আলোকচ্ছটার চেয়েও লাখো লাখো গুন বেশী। নিবে যাওয়ার আগে বাতি যেমন ধপ করে জ্বলে উঠে—এও তেমনি আর কি। মাহাকাশের ক্রাব নীহারিকার (Crab Nabula) মধ্যে তোরাস (Taurus) নামে একটি তারা ছিলো। এটি যখন মারা যায় বিজ্ঞানীরা (১০৫৪ খ্রীস্টাব্দে) তার উজ্জ্বল আলো দেখেছিলেন।

সবগুলো তারাই যে এমনি করে সুপারনোভা অবস্থার মধ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ করে একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়, তাও অবশ্য নয়। আবার কোনো কোনোটার অংশ বিশেষ থেকেও যায়। থেকে যায় ওই সাদা গোলাকার ক্ষুদে বলটা।

অবশ্য শেষ দিন পর্যন্ত যা থাকে, তা ঠিক ওই বলটাও নয়। ওটাও ক্ষয় হতে হতে আরো ক্ষুদ্র আকৃতি প্রাপ্ত হয়। ওই সাদা বলটি হয়তো ক্ষয় হয়ে একটি সাদাবলেরও (White dwarf) এক কোটি ভাগের এক ভাগ আকার প্রাপ্ত হয়। তখন এর এক চা চামচের এক চামচ পদার্থের ওজন হয় কোটি টনের সমান।

একেই অর্থাৎ এই বিস্ময়কর বস্তুটিকেই বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন নিউট্রন নক্ষত্র (Nautron star)· এই নিউট্রন নক্ষত্রগুলো এক একটি এতো ক্ষুদ্র যে এদের দেখাই যায় না। এক একটি তারা নাকি একটি অলপিনের মাথার সামানও হতে পারে।

কিন্তু ক্ষুদ্র হলে কি হবে? এর যে বিস্ময়কর কার্যক্রম, তা কিন্তু সত্যি অবিশ্বাস্য। এই ক্ষুদে তারাই মহাকশে প্রেরণ করতে পারে মহাশক্তিশালী বেতার তরঙ্গ। মহাকাশে বেতার তরঙ্গ সৃষ্টিকারী এই বিস্ময়কর শক্তিশালী তারা বিন্দুকেই বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন

পালসার (Pulsars)। বিজ্ঞানীরা মহাকাশে এই ধরনের বিস্ময়কর প্রায় ৩০০টি নিউট্রন নক্ষত্র সনাক্ত করেছেন।

মহাকাশের কোথাও যদি এমনি কোনে ক্ষুদে দৈত্য পড়ে থাকে, যার অকৃতি হয়তো আলপিনের মাথারমতো, কিন্তু ওজন বহু কোটি টন, এর মধ্যাকর্ষণ শক্তি এতো বেশী যে তার রাহু গ্রাস থেকে কোনো বস্তুই রেহাই পাবে না। এর আশ পাশ দিয়ে যে বস্তুই যাবে, ওটাকেই সে গ্রাস করে ফেলবে। এমন কি আলো পর্যন্ত গ্রাস করে ফেলতে পারে। এর আশ পাশ দিয়ে আলোও অসতে পারে না। তাই এর চার পাশ সর্বক্ষণ থাকে গাঢ় অন্ধকার। আর এটাকেই বিজ্ঞানীরা বলেন—কৃষ্ণ গহ্বর বা ব্ল্যাক হোল। যার কথা একটু আগেও একবার উল্লেখ করেছি, এটা নিজেও অদৃশ্য, এর পাশ দিয়ে যে যাবে তাকেও সে গ্রাস করে ফেলে অদৃশ্য করে দেবে। এটাকেই আমি বলেছি তারার ভূত।



তারার শরীর থেকে গ্যাস ও আলো ব্ল্যাক হোলের আকর্ষণে কালো গর্তে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

একটি ব্ল্যাক হোল মহাকাশের এক একটি তালাবিহীন ঝুড়ি। মহাকাশের এই তলাবিহীন ঝুড়ি আবিষ্কারে ঘটনাও এক মজারকথা।

বিজ্ঞানীরা মহাকাশে শক্তিশালী দূরবীন ধরে তারাদের অবস্থান জানার চেস্টা করছেন। মহ্যকাশে বা কোথায় কি আছে তা বুঝার চেস্টা করতে গিয়েই তাঁদের চোখে ধরা পড়েছে এই বিশ্বের বিস্ময়

কৃষ্ণগহবর। বিজ্ঞানীরা দূরবীন দিয়ে দেখেছেন মহাকাশের হঠাৎ হঠাৎ কোনো কোনো স্থানে এমন অন্ধকার যে, সেখানে কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না। মহাকাশের বিরাট বিরাট এলাকা জুড়ে এই কালো গর্ত। সেখানে কি আছে তাও জানা যায়নি। তবে এই সব কৃষ্ণ-গহবর থেকে ভেসে আসে এক ধরনের মহাশক্তিশালী বেতার সংকেত। এই সংকেত খুবই শক্তিশালী। কিন্তু এযে কতদূর থেকে আসে, তার কোনো হিসাব পাওয়া যাচ্ছেনা। এগুলোকেই বলে কুয়াসার। এই বিশ্বর প্রহেলিকা কুয়াসারকে নিয়ে তাই বিজ্ঞানীদের গবেষণার আজো শেষ নেই। তাই বলা হয়—নক্ষত্র নিয়ে গোটা বিশ্ব, আর গোটা বিশ্বের বিস্ময়ও এই নক্ষত্রই।

মার্চ, ১৯৭৯

আকাশ থেকে উল্কা পড়ে খসে

রাতের আকাশের দিকে তাকালেই দেখা যায় যে আকাশের ওই কোটি কোটি তারার মাঝখান থেকে হঠাৎ একটা তারা যেনো কেমন করে সহসাই খসে পড়ছে। খসে পড়া তারাটা খনিক দূরে এসেই আবার নিবে যায়।

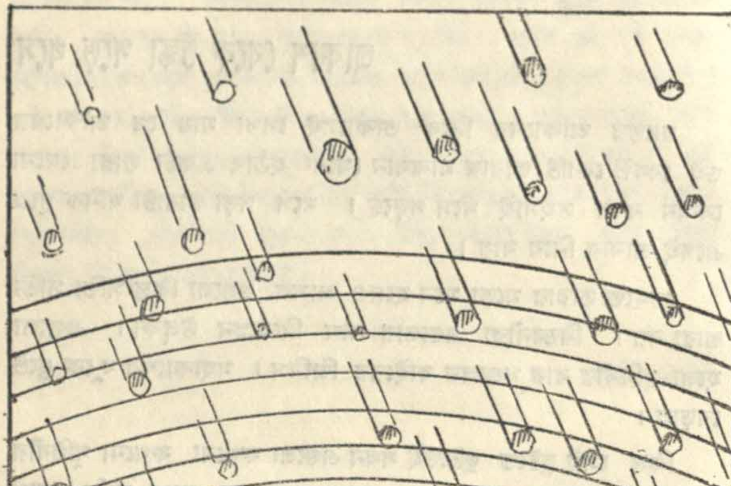
দেখতে তারার মতো মনে হলেও আসল ওগুলো কিন্তু সত্যি সত্যি তারা নয়। বিজ্ঞানীরা এগুলোর নাম দিয়েছেন উল্‌কা। এগুলো হলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরের জিনিস। মহাকাশের বুকে ছুটে বেড়ায়।

কিন্তু সেই ছুটতে ছুটতেই যখন এগুলো কখনো কখনো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভিতরে ঢুকে পড়ে, তখন বাতাসের সাথে ঘর্ষণ লেগে দপ করে জ্বলে উঠে এবং সেই জ্বলতে জ্বলতেই নীচের দিকে নামতে থাকে। কখনো কখনো একেবারে পৃথিবীর মাটিতেও এসে পড়ে। তবে অধিকাংশ সময়েই মাটিতে পড়ার আগেই জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়—শূন্যেই ছাই হয়ে উড়ে যায়।

এই জিনিসগুলো যে কি তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে সমান্য মতবিভেদ আছে। যেমন—কোনে কোনো পণ্ডিত মনে করেন—এগুলো হলো—কোনো বড় ধুমকেতুর গা থেকে ছিটকে পড়া টুকরো টুকরো অংশ। আবার কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন,—এগুলো হয়তো পৃথিবী যখন সৃষ্টি হচ্ছিলো তখনতো সে টগবগ করে ফুটতো আর বন্‌ বন্‌ করে ঘুরতো। সেই সময়েই পৃথিবীর গরম আর গলিত দেহ থেকে টুকরো টুকরো অংশ বাইরে ছিটকে পড়েছিলো। এগুলো হয়তো সেই টুকরো অংশই। তবে প্রথম মতকেই অধিকাংশ পণ্ডিত সমর্থ করে থাকেন।

ধূমকেতুর শরীর থেকে যে সমস্ত টুকরো অংশ ছিটকে পড়ে উল্কার জন্ম হয়েছিলো—সেগুলোও কিন্তু সূর্যের আকর্ষণে মহাকাশের নিয়ম মোতাবেক সূর্যকেই প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এবং সেই জন্মদাতা

ধূমকেতুর পথ ধরেই ঘুরতে থাকে। সেই হিসেবে এগুলোকেও গ্রহাণু বা গ্রহকণিকা বলা যেতে পারে।



এমনি করে অবিরাম আকাশে উল্কাবৃষ্টি হচ্ছে।

এখন একই সৌরজগতের মধ্যে পৃথিবীও ঘুরছে এই গ্রহকণিকা গুলোও ঘুরছে। তাই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে এই টুকরো

গুলো ভাসমান অবস্থায় ঝাঁকে ঝাঁকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভিতরে ঢুকে পড়ছে। এগুলোকেই বলা হয় উল্কাপাত। এগুলোকেই আমরা রাতের আকাশে তারার মতো ছুটে পড়তে দেখি।

বিজ্ঞানীগণ হিসেব করে দেখেছেন যে প্রতিদিন প্রায় ২০ কোটি উল্কা ঝাঁকে ঝাঁকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। তবে এর অধিকাংশই পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করার আগেই জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই উল্কাপাতের ফলেই নাকি পৃথিবীর ওজন প্রতিদিন প্রায় একশত টন করে বেড়ে যাচ্ছে।

রাতের আকাশের ওই তারা খসে পড়ার দৃশ্য সারা বছর ধরেই চোখে পড়ে। কিন্তু বিজ্ঞানীগণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখেছেন যে বিশেষ বিশেষ সময়ে যেনো এই উল্কাপাতের পরিমাণ কিছুটা বেড়ে যায়।

এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে এই সময় পৃথিবী তার আপন কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে এক একটা ভাঙা ধূমকেতুর কাছাকাছি এসে পড়ে আর তখন সেই ধূমকেতুর টুকরো অংশগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—বছরে ২৭শে নবেম্বর পৃথিবী তার আপন কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে বয়েলার নামে একটি ধূমকেতুর কক্ষ পথে এসে পড়ে। তখন স্বাভাবিকভাবেই ওই ধূমকেতুর টুকরো অংশগুলো উল্কারূপে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকতে থাকে।

তাই দেখা গেছে যে—এই নবেম্বর মাসেরই ১২, ১৩ এবং ১৪ তারিখ, আগস্ট মাসের ৯. ১০ এবং ১১ তারিখ এবং এপ্রিল মাসের ২১শে তারিখে বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় অনেক বেশী উল্কা-পাত ঘটে। কখনো কখনো এই ঝাঁক মাটিতেও এসে পড়ে এবং পৃথিবীর মানুষের অনেক ক্ষতিসাধন করে।

এমনি একটা ভয়ংকর উল্কাপাত ঘটেছিলো ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ায় সাইবেরিয়া অঞ্চলের তুংপুশ্‌কা নদীর তীরে। এই নদীর তীরে পড়েছিলো বলেই লোকে এর নামও দিয়েছে—তুংপুশকা উল্কা।

এই উল্কাটি এতো বিরাট ছিলো যে শত কিলোমিটার দূরে থেকেও নাকি মানুষ সম্পূর্ণ দিনের আলোতেই এটি দেখতে পেয়েছিলে এব

এর প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা গিয়েছিলো প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে থেকেও।

তুংগুশকা নদীর তীরে যে উল্কাটির ধ্বংসাবশেষ মাটিতে পড়েছিলো তার ওজন ছিলো প্রায় কয়েকশত টন। আর এটা পতনের ফলে যে আগুন জ্বলে উঠেছিলো তার ঝলকানিতে আশপাশের প্রায় ৩২ কিলোমিটার এলাকায় গাছপালা, ঘাস সমস্ত কিছু জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিলো।

উনবিংশ শতাব্দিতেও পৃথিবীতে বার কয়েক এই উল্কার ঝাঁক নেমে এসেছিলো। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করে দেখেছেন যে এই শতকের প্রতি তেত্রিশ বছর অন্তর অন্তর এই উল্কার ঝাঁক নেমে আসে। এর মধ্যে যে ঝাঁকটি সবচেয়ে বেশী প্রচণ্ড বেগে নেমেছিলো আর সবচেয়ে চোখ ঝলসানো আলো ছড়িয়ে ছিলো—সেটি নেমেছিলো ১৮৩৩ সালে।

এই ধরনের উল্কাপাত ঘটছে বিংশ শতাব্দীতেও। ১৯৭৭ সালের নবেম্বর মাসেও ঘটেছে মালাগাছির আকাশে এমনি একটি উল্কাপাত। হয়েছিলো মালাগাছির উল্কাটি সেই দেশের স্থল ভাগে পড়েছে না জলভাগে পড়েছে সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা হয়নি, তবে সে উল্কাটি পড়ার সময় প্রচণ্ড নীল আর হলুদ আলো যে ছড়িয়েছিলো সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। শত শত কিলোমিটার দূর থেকেও নাকি এই আলো দেখা গিয়েছিলো এবং এর প্রচণ্ড আওয়াজও শোনা গিয়েছিলো।

এর কিছুদিন পরেই আরেকটি উল্কার খবর পাওয়া গেলো ইরাক দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে। ইরাকে যে উল্কাটি পড়েছে সেটি মাটিতে এক গজ পরিমাণ ব্যাস গর্ত করে বারো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলো। এটির ওজন ছিলো ৫৫ পাউণ্ড।

॥ ২ ॥

আকাশে থেকে মাটিতে উল্কাপাতের কথা মানুষ প্রায় বহু প্রাচীনকাল থেকেই জানতে পেরেছে। অনেক প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে এর তথ্য মিলেছে। অন্তত পক্ষে ৬শত খৃীস্টপূর্বাব্দের আগের লেখা গ্রন্থাবলীতেও এর নিদর্শন আছে।

চীন ও ইউরোপের প্রথম দিকের লেখা কোনো কোনো প্রাচীন গ্রন্থে একটি বা একাধিক তারা ঝরার কথা লেখা আছে।

উল্কাপাতের প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করতে না পারার জন্য এর সম্বন্ধে আদিম মানুষের একটা অন্যরকম ধারণা ছিলো। আদিম যুগের মানুষেরা মনে করতো এগুলো হলো—স্বর্গের দেবতাদের ধনুকের তীর বা মহাজাগতিক অগ্নিপিণ্ড।

পৃথিবীর মানুষ অসৎ। তারা শুধু পাপ কাজ করে তাই স্বর্গের দেবতারা মাঝে মাঝে এসব দেখে ভীষণ রেগে যান। তখন পৃথিবীর মানুষকে শাস্তি দেয়ার জন্য তারা তীর ছুঁড়েন।

প্রাচীন কালে মানুষের উল্কাপাত সম্পর্কে এই ধারণা হওয়ার একটি কারণ হলো—উল্কাপাতের পর পরই দেশে দুর্ভিক্ষ, অনাহার, রোগব্যাধি, মহামারী ও মৃত্যুর বিভীষিকা নেমে আসে। এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যই হয়তো মানুষের মনে অমন একটি কুসংস্কার দানা বেঁধেছিলো।

তাই পৃথিবীর মানুষ ভয় পেয়ে দেবতার আক্রোশ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উল্কাপিণ্ডকে পূজা করতো।

পূজা পার্বণের মধ্যে এফেসিয়ানদের প্রস্তর পূজো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এফেসিয়ানরা ছিলো বর্তমান তুরস্কের একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর এফেশাসের অধিবাসী। তারা চন্দ্রদেবীর মন্দিরে একটি পাথরকে পূজো করতো। তাদের ধারণা ছিলো—পাথরটি আকাশ থেকে পড়েছিলো। এটি স্বর্গের দেবতারাই ছুঁড়ে মেরেছেন। অনেক পণ্ডিত এখন অনুমান করেন—সম্ভবত সেটি কোনো উল্কাপিণ্ডের অংশ।

প্রাচীন গ্রীসের ডেলফির মন্দিরে সূর্যদেব এ্যাপোলোর পূজো করা হতো। কিন্তু এই এ্যাপোলোর মূর্তি ছাড়াও সেখানে একটি কালো পাথর একইভাবে দেবপূজো ভোগ করতো।

সম্রাট নুমা পমপীলয়াসের রাজত্বকালে রোম দেশে একটি উল্কাপাত ঘটেছিলো। এই উল্কাটির আকৃতি ছিলো অনেকটি সৈন্যদের লোহার তৈরি যুদ্ধের ঢালের মতো। তাই দেখে সম্রাট মনে করলেন নিশ্চয়ই স্বর্গের দেবতাগণ তাঁকে উপহার হিসেবে এই ঢাল পাঠিয়েছেন। তখন সেই পাথরটিকে পুরোহিত বিদ্যাপীঠে সযত্নে ও স্থায়িভাবে রেখে দেয়া হলো।

প্রাচীন মেক্সিকোর একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে একটি উল্কাপিণ্ড উদ্ধার করা হয়। লোহার এই পিণ্ডটি মমির কাপড় দিয়ে

সযত্নে মোড়ানো ছিলো। এ দেখে অনুমান করা হবে—নিশ্চয়ই এটাকেও অতীব সযত্ন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।



উল্কার পাথর নিয়ে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন।

আলস্যাসের এনসিনহাইমে ১৪১৯ সালে একটি উল্কাপাত ঘটে। জার্মানীর রাজা প্রথম ম্যাক্সিমিলিয়ান এটিকে তুর্কীদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের নির্দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তাঁরই আদেশে উল্কা পিণ্ডটি গ্রামের গীর্জায় রাখা হয়। সেটি এখনো সেখানে রক্ষিত আছে।

১৮৮৫ সালের কাছাকাছি সময়ে ভারতে একটি উল্কা পড়েছিলো। এই উলকাপিণ্ডটি এখনো প্রত্যহ সপ্ত উপাচারে পূজো পেয়ে আসছে।

কোনো কোনো উলকা এতো বিশাল যে তা শুনলেই আবাক হতে হয়। বহু বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার এমনি একটা উল্কা পড়েছিলো। —এটার ওজন ছিলো ৬২ মেট্রিক টন। শুধু এটাই নয়—আমেরিকার অ্যারিজোনা নামক স্থানে আজ থেকে ৫০ হাজার বছর আগে যে উল্কা পিণ্ডটি পড়েছিলো তার চেহারা ছিলো এরচেয়েও বিশাল। এটা যেখানে পড়েছিলো—সেখানে যে গর্ত হয়েছিলো সেই গর্তটার পরিমাণই ছিলো

চার হাজার ফুট চওড়া আর ৬ শত ফুট গভীর। তাহলে এই পিণ্ডটার আকৃতি কত বড় ছিলো তা একবার ভেবে দেখা যায়। এই সুবৃহৎ খাদটার নাম দেয়া হয়েছিলো 'শয়তানের খাদ'।

॥ ৩ ॥

এই পৃথিবীর বুকে পতিত উল্কা খণ্ডগুলো পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে এর মধ্যে যে যে ধাতু আছে তার মধ্যে লোহার আর পাথরের পরিমাণই বেশী। তবে বড় বড় উল্কাপিণ্ডের মধ্যে লোহার ভাগই বেশী। প্রাচীন যুগের অনেক রাজা বাদশা এই উল্কার লোহা দিয়ে নাকি নিজেদের তলোয়ার তৈরি করতেন। শুনা যায় পারস্যের রাজা আর তিব্বতের দলাইলামাদের তরবারী নাকি এই উল্কার লোহারই তৈরি ছিলো।

মহাকাশের বিচিত্র বস্তু উল্কার উৎপত্তি নিয়ে এখনো পণ্ডিতগণ গবেষণা করে যাচ্ছেন। তবে এ সম্পর্কে বিশেষ মৌলিক প্রশ্নের জবাব পেতে হলে গ্রহের উৎপত্তিসহ মহাকাশ বিদ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

উল্কাপিণ্ডের গঠন কার্য সম্পর্কে আরো কিছু জানা গেলে সৌরজৎ তার উৎপত্তি ও চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে অনেক অজানা রহস্যের সমাধান হতে পারে।

নবেম্বর, ১৯৭৭

রহস্যময় উড়ন্ত সসার

এখন যে বস্তুটার কথা বলতে যাচ্ছি সে যে কী জিনিস তা আমি নিজেই জানিনে। জানি আমার কথা শুনে কেউ কেউ হাসাহাসি করতে পারে। কেউ হয়তো ঠোঁট উল্টে বলেই ফেলেতে পারে, যা নিজেই জানেন না, তা আবার অপরকে শোনাবেন কি ?

কিন্তু তবু বলছি, স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই, বস্তুটার কথা আমি সত্যি কিছু জানি না। তবু অবাক হবার কাণ্ড এই যে শুধু আমি কেনো, পৃথিবীর কেউ-ই, এমন কি বড় বড় ডাকসাইটে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পর্যন্তও বলতে পারছেন না বস্তুটি কি ? আমি তো একজন সাধারণ মানুষ।

বিজ্ঞানীরা এই অজানা রহস্যময় বস্তুটার একটি নাম দিয়েছেন। নামটি হলো "সসার" বা চাকী। মহাকাশে উড়ে বেড়ায় বলে একে উড়ন্ত সসার বলা হয়। দীর্ঘদিন থেকে এই রহস্যময় উড়ন্তসসার বস্তুটি পৃথিবীর তাবৎ লোককে একেবারে গোলক ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। কেউ এর রহস্য উদ্ধার করতে পারছেন না। চোখের এক পলকের জন্য দেখা যায়। কিন্তু এই পর্যন্তই, তারপরই আবার মিলিয়ে যায় কোথায়। কোথা থেকে আসে ? কেমন করে আসে ? কেনো আসে ? এসব প্রশ্ন আজ পৃথিবীর মানুষকে দারুণ ভাবিয়ে তুলেছে।

এই রহস্যময় বস্তুটাকে পাকড়াও করার জন্যও বহুবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু লাভ হয়নি। একে ধরা যায়নি। বিগত কয়েক বছর আগে এই উড়ন্ত সসারের পেছনে খুব দ্রুতগতিসম্পন্ন বিমান পাঠানো হয়েছিলো। কিন্তু ধরা যায়নি। বরং বিমানগুলোই নষ্ট হয়ে গেছে। ওটার ভিতর থেকে কি এক জাতীয় গ্যাস বেরিয়ে এসে ধাওয়া করা বিমানগুলোকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলো।

বছরের পর বছর ধরে মহাকাশের এই রহস্যময় বস্তু উড়ন্ত সসার সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে। নানা মুনির নানা মত। কেউ বলে

এগুলো কোনো দেশের গোয়েন্দা বিমান। কেউ আবার বলেন, না, না এগুলো পৃথিবীর কোনো বস্তুই নয়। নিশ্চয়ই ওগুলো সৌরজগতের অন্য কোন গ্রহ থেকে আসছে। নিশ্চয়ই বাইরের অন্য কোনো গ্রহে পৃথিবীর চেয়েও অনেক উন্নত ও সভ্য মানুষ বাস করে। তারাই ও গুলো পাঠাচ্ছে। তাই যদি হয়, তা হলে কোন্ গ্রহ থেকে আসতে পারে?

অতি আগে মানুষের ভ্রান্ত ধারণা ছিলো সৌরজগতের মঙ্গল গ্রহের মানুষ আছে। যারা আমাদের চেয়েও ঢের বুদ্ধিমান। তারাই হয়তো পৃথিবীর মানুষ নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে। এই উড়ন্ত সসার হচ্ছে মঙ্গল গ্রহের মানুষের রকেট। অবশ্য এগুলো ছিলো উড়ো কথা। মানুষের মুখের কথা এবং কল্পকাহিনী।

কিন্তু গত ১৯৭৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র, থেকে প্রেরিত 'ভাইকিং-২' নামে একটি রকেট গিয়ে নেমেছিলো মঙ্গল গ্রহের মাটিতে। প্রেরিত তথ্য থেকে জানা গেছে সেখানে মানুষ থাকাতো দূরের কথা কোন প্রাণেরই অস্তিত্ব নেই।

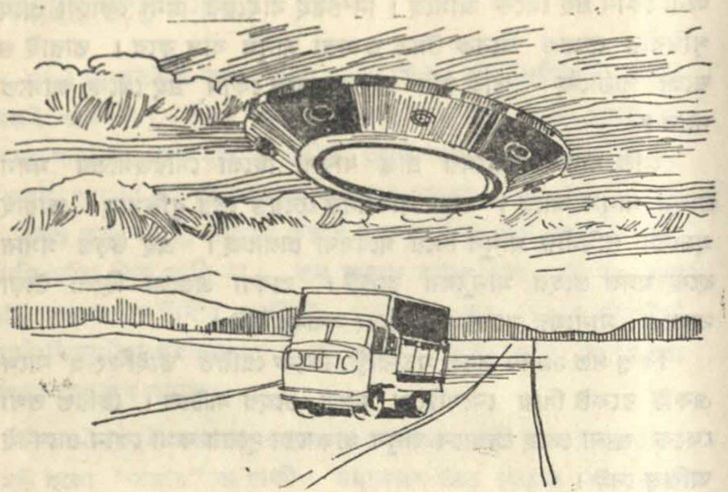
শুধু তাই নয়, এখন এটা স্থির জানা হয়ে গেছে যে, একমাত্র পৃথিবী ছাড়া সৌরজগতের আর কোন গ্রহেই প্রাণের অস্তিত্ব নেই। তাহলে নিশ্চই এই উড়ন্ত সসার আরো দূরের কোনো গ্রহ থেকে আসছে। তবে সেটা কোন গ্রহ? কোন সৌরজগত?

এই প্রশ্ন মানুষের অনেক দিনের। এই প্রশ্নের পেছনে ইন্ধন যুগিয়েছে বাইরে থেকে আসা এই উড়ন্ত সসার সম্পর্কিত নানা কাহিনী। আর সে কাহিনী শুনে মানুষের কল্পনার সীমা আরো অনেক দূর সম্প্রসারিত হয়েছে।

বাইরের জগৎ থেকে পৃথিবীর বুকে নভোযান আসার কহিনী যেমন বিচিত্র, তেমনি অবিশ্বাস্যও। যেমন—কেউ কেউ এমন কথাও বলে থাকেন যে,—পৃথিবীতে এই নভোযান আসা শুরু হয়েছে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে। হাজার হাজার বছর আগেই ভিন্ন গ্রহের প্রাণি এসে পৃথিবীতে নেমেছে এবং পৃথিবীর মানুষকে অনেক কারিগরি কলাকৌশলও শিখিয়ে গেছে।

যেমন—মিশরের প্রাচীন পিরামিড, যার নির্মাণ-কৌশল এই বিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছেও বিস্ময়ের বস্তু। এগুলো নির্মাণে নাকি

ঐ ভিন্ন গ্রহের মানুষেরাই কারিগরি জ্ঞান দান করেছিলেন এমন অনেক আজগুবি কথাও প্রচলিত আছে।



পথে একটি গাড়ী চলছে। সহসা তার উপরে যেনো নেমে আসছে একটি উড়ন্ত সসার। এমনি কাল্পনিক কাহিনী প্রচলিত আছে অনেক।

ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায়, খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে ১৪৫০ পর্যন্ত মিশরীয় ফারাও-এর তুতমস (৩য়) এর রাজত্বকালের দ্বাবিংশ বর্ষের তৃতীয় মাসের শীতকালে আকাশে দেখা দেয় এক বিচিত্র ধরনের আগুনের গোলা। এই গোলার আক্রমণকে ঠেকানোর জন্য ফারাও তার সৈন্যবাহিনীকে সতর্ক থাকার আদেশ দেন। কিন্তু সেই আকাশের গোলাগুলো শেষ পর্যন্ত কোনো আক্রমণ করেনি। উড়ে গিয়েছিলো, অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো আকাশেই।

এর পরের আরেক ঘটনা ঘটে প্রাচীন রোম নগরীতে। খ্রীস্টপূর্বাব্দ ২১৬ সালে ইটালীর অকোশে দেখা দেয় এক ধরনের উজ্জ্বল রঙের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উড়ন্ত জাহাজ এবং ৯৯ ও ৯০ খ্রীস্টপূর্বাব্দেও রোমের আকাশে হানা দেয় এমনি এক ধরনের অগ্নি গোলক।

সোনালী রঙের এই গোলকগুলো মুহূর্তের জন্য পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করেই আবার আকাশে উড়ে চলে যায়।

তারপরেও বারে বারে পৃথিবীর আকাশে আগমন ঘটেছে এই বিচিত্র উড়ন্ত বস্তুটির।

১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দের ৯ই জুলাই তারিখে জার্মানীর লিপ্‌জিগ শহরের নাগরিকগণ আকাশে দর্শন করেন এক মহাজাগতিক নভোযান। ১৭৫৬ সালে সুইডেনের অধিবাসীরাও দেখেন এমনি একটি অদ্ভুত আর রহস্যময় কিছু উড়ন্ত বস্তু।

১৮৯৭ সালের এপ্রিল মাসে ক্যানসাসের হ্যামিলটন কৃষি খামারের কৃষকরা দেখেছিলো একটি উড়ন্ত জাহাজ। এটি নেমে এসেছিলো খামারে। আর জাহাজের ভেতর থেকে অদ্ভুত ধরনের কিছু ক্ষুদে প্রাণী নেমে এসে খামারের একটি বড় ষাঁড়কে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো সেই জাহাজে। অবশ্য এই গল্পকে কেউ বিশ্বাস করেনি।

এর পরের ঘটনা ঘটে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। একটি মার্কিন বোমারু বিমান জার্মানির উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো। এমন সময় বিমানের পাইলট লক্ষ্য করলেন কি যেনো উজ্জ্বল গোলাকার বস্তু তাদের অনসরণ করছে। পাইলট মনে করলেন নিশ্চয়ই নাজী বাহিনীর বিমান তাকে দেখে ফেলেছে। এ মুহূর্তে তিনি কি করবেন তার নির্দেশের জন্য রাডার স্টেশনের সাথে যোগাযোগ করলেন। কিন্তু রাডার স্টেশন থেকে জানানো হলো—আকাশে শুধু তিনি ছাড়া আরতো কেউ নেই। রাডারের পর্দায় অন্য কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই।

১৯৪৭ সালের ২৪শে জুন তারিখেও মার্কিন বিমান চালক আরনল্ড সাহেব দর্শন করেন এমনি এক উড়ন্ত বস্তু। তিনি যখন রেইনিয়ার পর্বতের উপড় দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলেন তখন দেখতে পান একঝাঁক বিমান উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণই তার ভুল ভেংগে ছিলো—ওগুলো বিমান নয়।

১৯৪৮ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে ঘটেছিলো একটি মর্মান্তিক ঘটনা। আকাশে দেখা এমনি একটি উড়ন্ত সসারকে বিমান নিয়ে অনুসরণ করতে গিয়ে মার্কিন বৈমানিক মেন্টেলের বিমানটিই এক অজ্ঞাত কারণে বিস্ফোরিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।

১৯৫২ সনের ১৯শে জুলাই তারিখে ওয়াশিংটনের জাতীয় বিমান কেন্দ্রের রাডারেও ধরা পড়ে ছিলো উড়ন্ত সসার।

বহুদিন থেকেই শুরু হয়েছে বস্তুটিকে নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা এবং সেই সাথে নানা ঘটনা দুর্ঘটনাও। মাঝে মাঝে এই উড়ন্ত সসারকে নিয়ে ঘটে যায় এক ঘটনা। দুর্ঘটনাও বলা যেতে পারে।

॥ ২ ॥

গত ১৯৭৮ সালের জানুয়ারীতেও পশ্চিম মধ্য ব্রাজিলে ঘটে গিয়েছিলো এক চমৎকার ঘটনা।

মাত্র ১১ বছরের ছোট্ট ছেলে ম্যানুয়েল রবার্টো আর তারই ছোটোভাই পাকলো। রঞ্চনোরলিস শহর থেকে ৪৮০ কিলোমিটার দূরে তাদের নিজের বাড়ীর বাগানে খেলা করেছিলো। এমনি সময় (২০ শে জানুয়ারী, শুক্রবার) সহসা আকাশের কোল থেকে নেমে এলো চক চকে একটি ইঞ্জিন। আর সেই অদ্ভুত ইঞ্জিনটির ভিতর থেকে নেমে এলো লাল পোশাক পরা ছোটো ছোটো লিলিপুটের মতো কতগুলো মানুষ।

তারা কোনো কথা বলেনা। শুধু আকারে ইঙ্গিতে সব কিছু জানায়। সত্যি শুনে ভয় পেয়ে যাবার কথা এই যে, লিলিপুটগুলো নাকি জোর করে ওদের দু' ভাইকে সেই অদ্ভুত ইঞ্জিনে তুলে নিয়ে গেলো। অবশ্য পরে বড়ভাই ম্যানুয়েল রবার্টোকে ওরা ফেলে গিয়েছিলো। কিন্তু ছোটোভাই পাকলোকে আর পাওয়া যায়নি। ম্যানুয়েলকে কাদামাখানো নোংরা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো।

আরো আবাক হবার কথা এই, রহস্যময় নভোযানটি যখন এখানে অবতরণ করে তখন আকস্মিকভাবে এখানকার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই সময় এমনি করে কেনো বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো তার কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা বিদ্যুৎ কোম্পানী দিতে পারেননি। অর্থাৎ এটা কোন যান্ত্রিক গোলযোগ নয়। রীতিমতে রহস্যময় ব্যাপার।

শুধু তাই নয়, এই শুক্রবার রাতে স্থানীয় কয়েক জন লোক ও নাকি আকাশে কি একটা চোখ ঝলসানো উজ্জ্বল বস্তু দেখতে পেয়েছিলেন।

অনেকে অবশ্য ম্যানুয়েল রবার্টোর কথা বিশ্বাস করেনি। বলছেন,—এসব বানানো কাহিনী, ছেলে মানুষী গল্প। কিন্তু তাহলেও

নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছিলো, যা স্বাভাবিক ভৌতিক ব্যাপারের চেয়েও অদ্ভুত, তা ঠিক, তা হলে সেই অতিভৌতিক ব্যাপারখানাই বা কি ? যার ফলে এতো কাণ্ড ঘটে গেলো ।

এতো গেলো ছেলেমানুষের কথা। পৃথিবীর অনেক গণ্যমান্য বিখ্যাত ব্যক্তিও কিন্তু এমন অদ্ভুত বস্তু আকাশে দেখেছেন। যাকে তাঁরা উড়ন্ত সসার বলেই মনে করেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট মিঃ জিমি কার্টারও নাকি এই আকাশের উড়ন্ত সসার দেখেছিলেন। এটা তাঁর প্রেসিডেন্ট হবার মাত্র এক দু' দিন আগের ঘটনা। একদিন রাতে তিনি হঠাৎ করে দেখলেন জর্জিয়ার আকাশে কি একটা উজ্জ্বল বস্তু উড়ে যাচ্ছে। তবে বস্তুটা কি তা তিনি ভালো করে ঠাহর করতে পারেননি। তাই পরে অনেক জ্যোতিবিজ্ঞানী মনে করেন প্রেসিডেন্ট যে উড়ন্ত বস্তুটি দেখেছেন ওটা হয়তো ছিলো শুকতারা। সসার টসার কিছু না। কিন্তু বিজ্ঞানীদের এই কথায় সাধারণ মানুষের কৌতূহল গেলো না।

অবশ্য তার কারণও ছিলো। এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে আরেকটি মজার ব্যাপার ঘটে যাচ্ছিলো। প্রায় একই সময়ে মহাকাশের উপর নির্মিত একটি ছায়াছবি "স্টার ওয়ারস" প্রদর্শিত হচ্ছিলো যুক্তরাষ্ট্রের বহু প্রেক্ষাগৃহে। একেবারে দারুণ হিট ছবি। প্রতিদিন প্রতিটি হলেই হাউসফুল যাচ্ছিলো।

শুনে অবাক হবার মতো ঘটনা যে, ২০ কোটি মানুষের দেশ যুক্ত-রাষ্ট্রে এ ছবির টিকিট বিক্রি হয়েছিলো ৪০ কোটি। তাহলে বুঝতেই পারা যায়, গোটা দেশের ছেলে বুড়ো জোয়ান কেমন করে সব একে-বারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো।

এখন স্টার ওয়ারস ছবির শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্য ও প্রেসিডেন্টের মহাকাশে অদ্ভুত বস্তু দেখা, এই দুয়ের দারুণ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেলো। হাজার হাজার চিঠি আসতে লাগলো হোয়াইট হাউসে। সব চিঠির এক ভাষা---মহাকাশের এই অদ্ভুত উড়ন্ত বস্তু সম্পর্কে একটা খোঁজখবর নেয়া হোক। খুঁজে বের করা হোক-ওটা কি ? এ প্রেক্ষিতে হোয়াইট হাউস কি পদক্ষেপ নিয়েছিলো তা অবশ্য জানা যায়নি।

মহাকাশের এই রহস্যময় বস্তুর উৎস সম্পর্কে যে কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিয়োজিত ছিলেন মিঃ কার্ল স্যাগান তাঁদের অন্যতম। তিনি কিন্তু এসব ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী নন। যদিও তিনি মনে করেন যে ২৫ হাজার কোটি তারা নিয়ে এই যে সুবিশাল ছায়াপথ, এর কোথাও না কোথাও পৃথিবীর মতো প্রাণের অস্তিত্ব থাকা খুবই স্বাভাবিক। তবু বাইরের বিশ্ব থেকে কোনো প্রাণি একেবারে সশরীরে এসে পৃথিবীর মাটিতে নেমেছে, এটা তিনি বিশ্বাস করেন না।

বাইরের বিশ্ব থেকে পৃথিবীতে নভোচারী আসার যে সমস্ত কাহিনী প্রচলিত আছে, তিনি তার প্রায় সবগুলোই চুলচেরাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন এবং সমস্ত দেখে শুনে ডঃ স্যাগানের ধারণা হয়েছে যে নভোযান আগমনের সামান্যতম প্রমাণও কোথাও নেই।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ কার্ল স্যাগানের মতে, অজানা উড়ন্ত বস্তু সম্পর্কে মানুষ এখন যেভাবে উৎসাহী হয়ে উঠেছে তাতে গ্রহমণ্ডলের আসল গবেষণার কাজই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। অথচ পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই এই গবেষণার গুরুত্ব কম নয়।

তাঁর মতে— মানুষের এই আগ্রহ দেখে যদি কোনো দেশের সরকার ঠিক করেন যে, বিজ্ঞানীদের এখন এই অজানা উড়ন্ত বস্তু সম্পর্কে আরো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান চালাতে হবে, তাহলে এই মহাকাশ গবেষণার মূল কাজই ব্যহত হবে। আর যদি সরকার পৃথিবীর বাইরের প্রাণের অস্তিত্ব আবিষ্কারের কাজে ব্রতী হতে বলেন, তা হলে অবশ্যি ক্ষতি নেই। ওটা একটা কাজের মতো কাজ বটে।

কিন্তু বাক বিতণ্ডার এখানেই শেষ নয়। মজার ব্যাপার হলো— এই রহস্যময় বস্তুটি সম্পর্কে একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী যখন হলফ করে বলছেন যে, ওসব সসার টসার বলতে কিছু নেই। সব আজগুবি গপপো, অপর দিকে আরেক বিজ্ঞানী বলছেন,—অমন একটা রহস্যময় বস্তু আকাশে অবশ্যি আছে।

দক্ষিণ পূর্ব মিসৌরীর রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ হ্যাবলী রাটলেজ বলেছেন,—এই উড়ন্ত সসার এর সন্ধান আমার জীবনকে সম্পূর্ণ পালটে দিয়েছে।

গত ১৯৭৩ সালে ডঃ রাটলেজকে যখন দক্ষিণ পূর্ব মিসৌরীর আকাশে অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তু দৃষ্টি গোচর হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে দেখতে বলা হয়, তখন তিনি এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। এরপর কয়েকবছর গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ চালিয়ে তিনি যেসব তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন, তা থেকে এ ঘটনাকে আর নিছক কল্পকাহিনী বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

ডঃ রাটলেজ রাতের পর রাত, দিনের পর দিন খোলা আকাশের নীচে, মাঠে, ময়দানে এবং পাহাড়ের পাদদেশে কাটিয়ে দিয়ে কাজ করেছেন। টেলিস্কোপ ক্যামেরা, স্পেকটোগ্রাফ প্রভৃতি সরঞ্জামে সুসজ্জিত হয়ে অন্যান্য সাথী পর্যবেক্ষকদের নিয়ে তিনি এই উড়ন্ত সসার নিরীক্ষণ অভিযান চালিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় সাত শতেরও উপরে ছবি তুলেছেন। তিনি বলেছেন,—একটা সত্য ঠিকই আছে। তবে প্রচলিত যুক্তিতর্ক দিয়ে সব ব্যাখ্যা করা যায় না এই হলো মুশকিল।

এই অভিযান চালানো কালে তিনি রাতে ও দিনে প্রায় একশত চল্লিশটিরও বেশী ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, —এর মধ্যে অন্তত ২৫টি ঘটনাকে আমার কাছে দারুণ অদ্ভুত বলে মনে হয়েছে। ১৯৭৩ সালের মে মাসে দু'সপ্তাহ পর পর আমি অত্যন্ত আশ্চর্য তিনটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করি। এর মধ্যে প্রথমটিতে আমি মিসৌরীর পিয়েডমন্ট নামক ছোটো শহরের অদূরে আকাশ থেকে ৪৫ সেকেণ্ড ধরে ১০টি আলোর গোলক নানা আকারে রূপান্তরিত হতে দেখি। আকাশের যে স্থানে এগুলো দেখা যায় সেখানে এ ধরনের কোন আলো থাকার কথা নয়। এর সপ্তাহ দু'য়েক পরে মিসৌরীয় ফামিংটন শহরের অদূরে তিনি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দফায় এমন অজ্ঞাত বস্তু প্রত্যক্ষ করেন।

১৯৭৩ সালের ২৪শে মে-র রাতে ডঃ রাটলেজ এবং আরো কয়েকজন পর্যবেক্ষক এমন একটি বস্তু লক্ষ্য করেন, যার উপর দিয়ে ত্রিভুজ আকৃতির একটি আলোর কাঠামো গড়িয়ে যাচ্ছিলো।

ডঃ রাটলেজ প্রথমে ধারণা করেছিলেন যে ওটা হয়তো কোনো বিশেষ ধরনের বিমান হবে। কিন্তু পরে তিনি সে সম্পর্কে আরো অনেক খোঁজ খবর নিয়ে বুঝতে পারলেন যে, ওটা বিমান নয়!

এরপরের রাতে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রায় চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার মুহূর্তে একটি বিশাল আকারের বস্তু দেখতে পান। এই বিশাল আকারের বস্তুটি থেকে চারটি আলো বের হচ্ছিলো। দুটি লাল এবং দুটি সাদা।

ডঃ রাটলেজ তাঁর দূরবীন দিয়ে দেখতে পান যে, বস্তুটির একটি ধাতব আবরণ রয়েছে এবং লাল আলোগুলোকে শার্সি থেকে বিচ্ছুরিত আলোর মতো ভাগ করা যেতে পারে। ডঃ রাটলেজ জোর দিয়েই বলেন, যে সব বস্তু তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সেগুলো কোথা থেকে আসছে, তা অবশ্য তাঁর জানা নেই। তবে তাঁর কাছে এমন সব প্রামাণ্য তথ্য রয়েছে যে আকাশে এসব বস্তু যে আশ্চর্যজনকভাবে মহড়া দিচ্ছে, তা মানুষের তৈরি বিমানের পক্ষে সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, দিন রাত আমি আকাশে শুধু যে অদ্ভুত যানবাহন ও আলোই দেখছি তাই নয়, সেগুলো আমার কাছে রীতিমতো বুদ্ধি-মত্তার সাথে পরিচালিত বলেও মনে হয়েছে। এরপর ১৯৭৮ সালে ১লা মে তারিখেও ইরানের আকাশে ২০টি অজ্ঞাত বস্তুকে উড়ে যেতে দেখা গিয়েছিলো। এগুলোর প্রত্যেকটি একটি জাম্বো জেটের চেয়ে ২০ গুণ বড়। কয়েকটি এয়ার লাইন্স-এর বৈমানিক এবং কর্মচারিগণ এগুলো দেখেছেন। এগুলোকে তারা রহস্যময় উড়ন্ত সসার বলেই মনে করেন।

তা হলে তো দেখাই যাচ্ছে, বস্তুটি কেমন অদ্ভুত আর রীতিমতো বিতর্কিত। তাইতো এতো কথা, এতোসব কাণ্ড-কারখানার কথা উল্লেখ করার পরও আসল কথাটাই বলতে পারলাম না। অর্থাৎ এই বিশ্ব জোড়া হুলুস্থুল সৃষ্টিকারী বস্তটি যে কি তাই বলতে পারলাম না।

পারবো কেমন করে? যেখানে ডঃ কার্ল স্যাগান আর ডঃ রাট-লেজ এর মতো বিজ্ঞানীরাই কিছু ঠাহর করতে পারছেন না, সেখানে আমি তো কোন ছার। আগে বিজ্ঞানীরা উড়ন্ত সসার নামের ওই অদ্ভুত বস্তটাকে পাকড়াও করুন। দেখুক ওটা কি, তারপর আমিও সব খোলাসা করে বলে দেবো। তাই বস্তুটিকে পাকড়াও না করা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

জানুয়ারী, ১৯৮০

মহাকাশে প্রাণের সন্ধান

এই যে বিশাল মহা বিশ্ব জগৎ, যার ওই সীমাহীন শূন্যতায় ছড়িয়ে আছে কোটি কোটি গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা। এ যে সত্যি সত্যি কতো বিশাল তা ধারণাও করা যায় না। এই মহাবিশ্বের কূলকিনারা বিজ্ঞানীরা আজো খুঁজে পাননি।

বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের দিনেও মানুষ তার সীমিত জ্ঞান আর সাধ্যি নিয়ে বিশাল বিশ্বের যেটুকু জানতে পেরেছে, তা একেবারেই যৎ সামান্য। বলতে গেলে কিছুই না। এখনো মানুষের কাছে গোটা বিশ্বটাই প্রায় অজ্ঞাত। কিছুই তার হয়নি জানা।

এই মহাকাশকে জানার জন্য মানুষ চেষ্টা করছে সুদীর্ঘকাল থেকেই। কিন্তু এই জানার মধ্যেও সম্প্রতি মানুষকে একটি জিনিস খুব বেশী কৌতূহলী করে তুলছে।

এই যে বিশাল বিশ্বেজগতের কথা বলছি, এই বিশাল বিশ্বের একটি অতি নগণ্য নক্ষত্র হলো আমাদের সূর্য। আর তার সৌরজগৎ। আবার সেই সৌর জগতেরই একটি নগণ্য গ্রহ হলো আমাদের মস্তবড় পৃথিবীটা। আর এই পৃথিবীর বুকেই যুগ যুগ ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা—এই প্রাণীকূল।

কিন্তু এখন কথা হলো—এই যে পৃথিবীর বুকের প্রাণীকুল, এই বিশ্বে এরকম আরো কোথাও প্রাণীকূল আছে কিনা। বিজ্ঞানীদের কৌতূহল এখানেই।

কূলহীন, কিনারা বিহীন এই মহাবিশ্বে আমাদের সূর্যের মতো অমনতো আরো কোটি কোটি নক্ষত্র রয়েছে। ঐ সমস্ত নক্ষত্রের মধ্যে কারো কারো সূর্যের মতো গ্রহমণ্ডলও আছে হয়তো। সেখানে আমাদের পৃথিবীর মতো দশ বিশটা গ্রহও নিশ্চয়ই আছে এবং তারাও পৃথিরীর মতোই তাদের কেন্দ্র বিন্দু সূর্যকে ঘিরে খুরপাক খাচ্ছে।

পৃথিবীর মতো গ্রহ হয়তো আছেই। কিন্তু পৃথিবীর মতো অবিকল এমন বিশাল জলরাশি বেষ্টিত, পাহাড়-পর্বত শোভিত এবং সর্বোপরি প্রাণীকুল মুখরিত কোনো বিচিত্র গ্রহ আছে কিনা সেটাই হলো আসল কথা।

এই যে বিশ্বের হাজার হাজার কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র রয়েছে, এর কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই প্রাণের অস্তিত্ব যে আছে—বিজ্ঞানীদের এটা দৃঢ় বিশ্বাস। অবশ্য বহির্বিশ্বে প্রাণের অস্তিত্ব যে আছেই-এমন কোনো তথ্য প্রমাণ মানুষের হাতে নেই। এটা কল্পনা মাত্র।

তবু এই কল্পনার উপর ভরসা করেই পৃথিবীর মানুষ তাকিয়ে আছে মহাকাশের দিকে। মানুষের আশা—হয়তো তারা এই বিশাল বিশ্বে একা নয়। তাদের সাথী নিশ্চয়ই আছে কোথাও।

কিন্তু সে সাথীরা কোথায়? কোন গ্রহে? কোন সৌরজগতে? কিংবা কোন নীহারিকায়? তা কেউ জানেনা। তবু বিশ্বাস কোথাও না কোথাও আছেই।

আমেরিকার জাতীয় জোতির্বিজ্ঞান সংস্থা (National Astronomy Society) এবং কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় (Carnell University) এর আয়ানোস্ফেয়ার কেন্দ্রের (Ionosphere Centre) মহা-পরিচালক অধ্যাপক ফ্রাংক ড্রাক (**Frank Drake**) বলেন,—প্রাণের যেসব রাসায়নিক তথ্য আমরা পেয়েছি, তাতে পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তির রহস্য জানার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর পরিবেশগত যে পরিস্থিতিতে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে, তা একান্তই রাসায়নিক সূত্রের সাধারণ নিয়ম।

শুধু ড্রাক সাহেবই নন, আমেরিকার কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণেল ল্যাবরেটরীর (Cornell Laboratory) প্ল্যানেটরী স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক কার্লস্যাগান (Carl Sagan) সাহেব বলেন,—পৃথিবীর ন্যায় প্রাণের উদ্ভবের মতো রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া এই বিশাল বিশ্বের কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই ঘটতে পারে। এটা আমরা অবশ্যই আশা করতে পারি।

তিনি আরো বলেন,—বিশাল বিশ্বের এই কোটি কোটি গ্রহের মধ্যে অন্তত পক্ষে একশো কোটি গ্রহে প্রাণের উদ্ভব ঘটার মতো পরিবেশ রয়েছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনুমান—প্রাণসৃষ্টির মৌল রাসায়নিক পদার্থের মূল উৎস হলো—মহাকাশে ভাসমান বিভিন্ন রকম গ্যাসের সংমিশ্রণ। এই পদার্থগুলো বজ্রপাত জনিত বিদ্যুৎ প্রবাহ এবং সৌরবিকিরণের দ্বারা রূপান্তরিত হয়।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, কয়েকটি গ্যাস যেমন-অ্যামোনিয়া, মিথেন ও জলীয়বাষ্প ইত্যাদির মিশ্রণে অতিবেগুনী রশ্মি প্রয়োগ এবং বিদুৎ প্রবাহিত করলে—এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থের জন্ম হয়—যেগুলো প্রাণের উদ্ভব ঘটাতে সহায়ক।

এধরনের পদার্থ মহাকাশে বহুস্থানেই ছড়িয়ে আছে। বিশেষ করে যে সমস্ত নক্ষত্র নতুন করে জন্ম নিচ্ছে তাদের চারপাশে যে গ্যাস ছড়িয়ে আছে, তার মধ্যে এধরনের গ্যাসও প্রচুর আছে।

মহাকাশে যে দুটি গ্যাসের সর্বাধিক প্রাচুর্য রয়েছে, সে দু'টো হলো হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। জীবদেহেও হাইড্রোজেন পরমাণু আছে প্রচুর পরিমাণে। আর হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেন মিলিত হয়ে জন্ম হয় জলের। জল হলো প্রাণের প্রধান পূর্বশর্ত। এছাড়া হাইড্রোজেনের আরো অনেক ক্ষমতা রয়েছে, হাইড্রোজন কার্বনের সাথে মিলিত হয়ে নানারকম যৌগিক পদার্থের জন্ম দিতে পারে। এই জন্যই হাইড্রোজেনকে বলা হয়ে থাকে-জীবনের রাসায়নিক ভিত্তি।

বিজ্ঞানীরা বলেন,—আজ থেকে কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীতে যে প্রাণের সঞ্চার হয়েছিলো, তার ভিত্তিও ছিলো কার্বন।

মহাকাশে যেসব নতুন তারকার জন্ম হচ্ছে সেসব তারকার মেঘ-মণ্ডলে যে সব গ্যাস আছে, সেগুলোর মধ্যে প্রধান হলো হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, কার্বণ, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন পরমাণু। এসব পরমাণুর দ্বারা এমন কিছু অণুর সৃষ্টি হয়, যেগুলো প্রাণ সৃষ্টির সহায়ক। এগুলোর মধ্যে কিছু সরল যৌগিক পদার্থ রয়েছে, যেগুলো পারস্পরিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে "গ্লাইসিন" নামে এক ধরনের অ্যামিনা অ্যাসিডের সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন,—মহাকাশের অবস্থা সর্বত্র অনুকূল না হলেও জীবন সৃষ্টিকারী এ ধরনের রাসায়নিক পদার্থের জন্ম হতে পারে।

কিন্তু কথা হলো, শুধু জীবন সৃষ্টির রাসায়নিক পদার্থের প্রাচুর্য

হলেই তো চলবে না, প্রাণ তৈরি হবার মতো উপযুক্ত পরিবেশও থাকতে হবে। নইলে হবে না।

এমন অনেক নতুন তারা আছে, যে গুলোর মেঘমালায় প্রাণ সৃষ্টির সহায়ক রাসায়নিক পদার্থ আছে ঠিকই, কিন্তু পরিবেশ নেই। যেমন—সৃষ্টির গোড়ার দিকে হয়তো তার চারপাশে ছিলো প্রচণ্ড গরম, অথবা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কিন্তু এর দুটোর কোনোটাই জীবন সৃষ্টির অনুকূল নয়।

সৌরজগতে অনুকূল তাপ আর আলো রয়েছে মাত্র সামান্য কিছু স্থানে। বিজ্ঞানীর বলেন,—সূর্য থেকে প্রায় একশত তিরিশ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে আছে এই পরিবেশ। যেখানে অবস্থান করছে আমাদের পৃথিবী।

পৃথিবীর সামনের গ্রহ শুক্র ও বুধ। এরা রয়েছে সূর্যের খুব কাছে। তাই সেখানে রয়েছে প্রচণ্ড উষ্ণতা। আর মঙ্গল সহ অন্যান্য গ্রহ রয়েছে অনেক দূরে; তাই সেখানে আছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কিন্তু এর কোনোটাই প্রাণ সৃষ্টির অনুকূল নয়। তাই সৌরজগতে পৃথিবীর অবস্থান এলাকাই প্রাণের উদ্ভবের একমাত্র উত্তম স্থান। তাই তো এখানে জীবন সৃষ্টি হয়েছে।

মহাকাশে উজ্জ্বল এমন আরো অনেক তারা আছে, যাদের প্রাণ সৃষ্টির এলাকা হয়তো আরো বিস্তৃত। হিসেব মতো সেখানে প্রাণ সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু হচ্ছে না। কারণ সেখানকার অনুকূল স্থানের বিস্তৃতি থাকলেও স্থায়িত্ব নেই। এই সব তারার জীবনকাল অত্যন্ত স্বল্প এবং আলো বা উষ্ণতার স্থিরতা নেই।

সূর্যের মতো অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল অথচ দীর্ঘায়ু বিশিষ্ট তারার সংখ্যা মহাবিশ্বে খুব বেশী নেই। কিন্তু সংখ্যায় কম হলেও একেবারে দুর্লভ নয়। বিজ্ঞানীরা বলেন,—আমাদের ছায়াপথের প্রায় এক-চতুর্থাংশ তারা এই পর্যায়ভুক্ত। যাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হতে পারে। হয়তো হয়েও গেছে। ধরা যাক--ছায়াপথের প্রতি এক লাখ তারার যদি একটি তারার মধ্যে মাত্র একটি গ্রহেও জীবনের অস্তিত্ব থাকে তাহলেও গোটা ছায়াপথে প্রায় দশ লাখ গ্রহ

আছে যেখানে প্রাণিজগত রয়েছে। হয়তো তাদের কোন কোন গ্রহের প্রাণীরা পৃথিবীর মানুষের চেয়েও অনেক বেশী বুদ্ধিমান।

যদি বিজ্ঞানীদের এই অনুমান সত্যি হয় এবং প্রাণের অস্তিত্ব থেকেই থাকে, তবে তা কোথায় আছে, তা অনুসন্ধান করে বের করতে হবে। যে সব গ্রহে মানুষের মতো প্রাণী আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তাদের বলতে হবে,—এই তো তোমরা আছ, আমরা আছি। আমরা কেউ বিশ্বে একা নই।

বহির্বিশ্বে প্রাণের সন্ধান করার জন্য তাই রাশিয়া, আমেরিকা এবং কানাডার মহাকাশ বিজ্ঞানীরা আকাশে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে কান পেতে বসে আছেন। যদি কারো পায়ের আওয়াজ পাওয়া নায়। যদি কোনো সুদূর মহাকাশের কোথাও থেকে সংকেত ভেসে আসে। এই আশাতেই পৃথিবীর মানুষেরা কান পেতে আছে।

॥ ২ ॥

বহির্বিশ্বে প্রাণের সন্ধানের প্রথম প্রচেষ্টা চালানো হয় ১৯৬০ সাল থেকে। এই প্রথম প্রচেষ্টা চালানো হয় যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভার্জিনিয়া রাজ্যের গ্রীন ব্যাংকের কাছাকাছি ন্যাশনাল রেডিও এস্ট্রনমী অবজারভেটরী (NRAO) থেকে।

এখানকার জ্যোতিবিজ্ঞানীরা গত ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল এই পর্যবেক্ষণ কাজ পরিচালনা করেছিলেন। এই সময় তাঁরা মহাকাশের প্রায় ৬৫০টিরও বেশী নক্ষত্রকে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

আশা ছিলো, হয়তো কোথাও না কোথাও থেকে সাড়া পাওয়া যাবেই। যতোদূর থেকেই হোক আর যতো ক্ষীণ কণ্ঠেই হোক, তাঁদের পাঠানো সংকেতের উত্তর হয়তো মিলবেই। কেউ না কেউ-ওপার মহাকাশ থেকে বলবেই---হ্যালো, হ্যালো, আমরা তোমাদের কথা শুনতে পাচ্ছি। তোমরা বিশ্বে শুধু একা নও। আমরাও আছি। এসো আমরা সবাই মিলে আন্তঃমহাকাশ ক্লাবের সদস্য হয়ে যাই, এসো। পরস্পরের সাথে যোগাযোগ হোক।

এখানে একটা কথা বলতে হয়। এই যে আমি একটু আগে যে ভাষায়, যে ভাবে কথাটা বললাম, বিজ্ঞানীরা কিন্তু

বহির্বিশ্বে প্রাণের সন্ধান করতে গিয়ে এ ধরনের কোনো ভাষার (Language) ব্যবহার করেন না। কারণ পৃথিবীতে প্রচলিত কোনো ভাষাতেই এই সংকেত পাঠানো যায় না।

আমি ওপরে যেভাবে কথাটা বললাম, ওটা আমারই নিজের কথা। তবে মানুষের মনের কথা। পৃথিবীর মানুষের হৃদয় হয়তো এমনি একটা ভাষায় কথা বলার জন্যই অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করছে।

বিজ্ঞানীরা মহাকাশে প্রাণের সন্ধান করতে গিয়ে যেভাবে বার্তা প্রেরণ করেন, তা একান্তই সাংকেতিক ভাষা। কোনো Language নয়। এ হলো এক ধরনের গাণিতি ক ফর্মুলা। এই ফর্মুলায় তৈরি সাংকেতিক ভাষাতেই পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা অনন্ত মহাকাশের অজ্ঞাত কোনো প্রাণীর কাছে প্রেরণ করছেন নিজের বার্তা। জানাচ্ছেন পৃথিবীর কথা, পৃথিবীর মানুষের কথা।

কিন্তু দুঃখের কথা হলো অদ্যাবধি মানুষের কোনো সংকেতেরই সাড়া মেলেনি। সংকেত শুধু পাঠানোই হচ্ছে। প্রত্যুত্তর আসেনি। কিংবা বাইরের বিশ্বেরও কোনো সংকেত পৃথিবীর মানুষেরা ধরতে সক্ষম হননি।

তবু মানুষের সংকেত পাঠানো বন্ধ হয়নি। মানুষ তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। অব্যাহত রয়েছে তাদের মনের উদ্যম। জেগে আছে হৃদয়ের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, তাদের ডাকের সাড়া একদিন নিশ্চয় মিলবে। মানুষ সেই আশাতে ভর করেই আরো অনেক দূর দূরান্তে আরো উন্নত পদ্ধতিতে পরিষ্কার ভাষায় পাঠাচ্ছে তাদের সংকেত আহবান। আরো অনেক বেশী শক্তিশালী যান্ত্রিক কান পেতে রাখা হচ্ছে মহাকাশের শূন্যতায়। যদি ডাক শোনা যায়।

রাশিয়াতে বহির্বিশ্বের প্রাণের সন্ধান করার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি স্টেট কমিশন। এখানে স্থাপন করা হয়েছে ৬০০ এন্টেনা বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী রেডিও টেলিস্কোপ।

অনুরূপ আরো একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান কেন্দ্র রয়েছে কানাডার অন্টারিও (Untario) নামক স্থানে। এই কেন্দ্রটির নাম হলোএ্যালগানকুইন রেডিও অবজারভেটরী (Algonquin Radio Observatory) এই

কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা মহাকাশের কাছাকাছি প্রায় সব নক্ষত্রের উপরই অনুসন্ধান চালিয়ে দেখছেন। তাঁরা দেখেছেন এই সব নক্ষত্রের কারো কোনো সৌরজগৎ আছে কিনা। যদি থাকে, তবে সেখানে পৃথিবীর মতো কোন প্রাণীর জগৎ রয়েছে কিনা। তা যেমন ধরনেরই হোক, প্রাণের অস্তিত্ব থাকলেই হলো।

অবশ্য এই গবেষণাতেও আশাব্যঞ্জক কিছু ঘটেনি। তবু অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এদিকে আমেরিকা আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে তার অধিকৃত ক্ষুদ্র দ্বীপ পুর্টোরিকোতে (Puerto Rico) বসিয়েছে আরো শক্তিশালী একটি অবজারভেটরী। এই অবজারভেটরীটির নাম হলো-অ্যারসিবো অবজারভেটরী (Arcibo observatory).

এখানে আছে একটি রেডিও টেলিস্কোপ। তিনশো পাঁচ মিটার ডায়ামিটার এন্টেনা বিশিষ্ট একটি অতিশক্তিশালী রেডিও টেলিস্কোপ। এটি সত্যি একটি বিশাল আর মহাশক্তিশালী যন্ত্র।

গত ১৯৬০ সালে আমেরিকার ওয়েস্ট ভার্জিনিয়াতে যে পুরোনো ধরনের রেডিও টেলিস্কোপ বসানো হয়েছিলো তার তুলনায় এর রেকর্ডিং শক্তি ছয় গুণেরও বেশী শক্তিশালী। গ্রীন ব্যাংকের সেই পুরানো টেলিস্কোপটিতে যে সংকেত রেকর্ড করতে দু'মাস সময় লাগতো--এই পুর্টোরিকোর টেলিস্কোপে তা রেকর্ড করতে সময় লাগে এক সেকেণ্ডের দশভাগের এক ভাগ। এই শক্তিশালী রেডিও টেলিস্কোপ দিয়েই গবেষণা চালানো হচ্ছে বহির্বিশ্বে।

বিখ্যাত মহাকাশ জ্যোতিবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড্রাগ বলেছেন বহির্বিশ্বের সাথে কথোপকথন বিশেষ করে মহাকাশের কোনো অজ্ঞাত এবং আমাদের তুলনায় হয়তো বা হাজার গুণে বেশি বুদ্ধিমান প্রাণীর সাথে কথোপকথন করার ক্ষেত্রে সত্যি জটিলতা রয়েছে। তারা আমাদের মতো মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতির সংকেত কি ধরতে পারবে?

তিনি মহাবিশ্বের বিশালতার প্রাণের সংকেতের সন্ধান করাকে একটি সুন্দর উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন। তিনি এই উপমা দিতে গিয়ে বলেন,—আমরা হয়তো মস্তবড় একটি খড়ের গাদার মাঝে হারিয়ে যাওয়া একটি সূঁচের সন্ধান করছি। উপমাটা আসলেও যথার্থ। এই বিশাল কূলহীন কিনারাহীন বিশ্বের কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্রের

সীমাহীন জঙ্গলের মধ্যে একটি সূক্ষ্মতম সংকেতের সন্ধান করতে যাওয়া ঐ খড়ের গাদায় সুঁচ খোঁজার মতোই ব্যাপার।

তিনি বলেন,—আর্বসিবো অবজারভেটারীর মহাশক্তিশালী রেডিও টেলিস্কোপের সাহায্যে পৃথিবী থেকে মহাকাশের তেত্রিশ কোটি কিলোমিটারের মধ্যে যাবতীয় নক্ষত্রের উপর চালানো হচ্ছে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা। খুঁজে দেখা হচ্ছে হাজার হাজার নক্ষত্রের চার-পাশ। কিন্তু কোথাও এমন কোনো আশার বাণী ধরা পড়েনি এখনো। তবে কোথাও কোথাও থেকে অতি ক্ষীণ ও সামান্য কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত ফ্রিকুয়েন্সি ধরা পড়ছে। কিন্তু তাও খুব সুবিন্যস্ত নয়।

তবু তা থেকেই কোনো কোনো বিজ্ঞানী অনুমান করেন—হয়তো কোথাও না কোথাও প্রাণী আছেই। তারা একদিন না একদিন পৃথিবীর সংকেত ধরতে পারবেই। আর পৃথিবীর মানুষের জন্য সেটা হবে সবচেয়ে সৌভাগ্যের ব্যাপার।

কেউ কেউ আবার বলেন,—হয়তো এমনও হতে পারে মহাকাশের কোথাও না কোথাও আমাদের তুলনায় অনেক বেশী বুদ্ধিমান প্রাণী আছেই। তারা হয়তো আমাদের চেয়েও ঢের বেশী সভ্য ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন। তারা হয়তো আমাদের উদ্দেশ্যে বেতার সংকেত প্রেরণ করছে ঠিকই। আমরা নিজেরাই হয়তো তা ধরতে পারছি না ঠিক মতো।

হয়তো তাদের টেলিফোন আসার আগেই আমরা রিসিভার তুলে বোকার মতো 'হ্যালো'—'হ্যালো' করছি। আর না হয় রিসিভার তুলতেই বেশী দেরী করে ফেলেছি। টেলিফোন বেজে উঠা বন্ধ হওয়ার অনেক পরে রিসিভার তুলছি।

বহির্বিশ্বের সম্ভাব্য উন্নতমানের প্রাণীরা আমাদের প্রেরিত সংকেত ধরতে পারছে হয়তো ঠিকই। হয়তো স্পষ্টভাবেই ধরতে পারছে। কিন্তু আমরা নিজেরাই কারিগরি জ্ঞানে অতখানি উন্নত নই বলে, কিংবা আমাদের অমনোযোগিতা বা অসাবধানতার কারণে আমরাই তা বুঝতে পারছি না।

পৃথিবীর অস্তিত্ব হয়তো ভিন্নগ্রহ থেকে অনুমান করতেও পারে। কারণ পৃথিবী থেকে টেলিভিশন ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে যে সব সংকেত পাঠানো হয় গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান।

আমেরিকার জ্যোতিবিজ্ঞানীরা প্রতিনিয়ত এখন মহাকাশ-যানের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে সংকেত প্রেরণ করছেন। এই সংকেতসমূহ মহাকাশ-যান থেকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে মহাবিশ্বের দিকে দিকে।

সর্বপ্রথম পৃথিবী থেকে সুনির্দিষ্ট যে সংকেত-বার্তাটি মহাবিশ্বের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিলো, সেটি পাঠানো হয়েছিলো ১৯৭৪ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখে। এই বার্তাটিও পাঠানো হয়েছিলো আরেসিবো অবজারভেটরী কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের দ্বারাই। এটি পাঠানো হয়েছিলো হারকুলেস (Hercules) নক্ষত্রমণ্ডলের বৃহত্তম তারকা মেসার-১৩ (Messir-13)-এর উদ্দেশ্যে। পৃথিবী থেকে এই নক্ষত্রটির দূরত্ব হলো ২৫,০০০ আলোকবর্ষ।

এই নক্ষত্রটির উদ্দেশ্যে পৃথিবী থেকে যে বার্তাটি প্রেরণ করা হয়েছিলো সেটি ছিলো তিন মিনিটের একটি গাণিতিক সাংকেতিক বার্তা। মোট ১৬৭৯টি সংকেতের সাহায্যে তৈরি হয়েছিলো এই বার্তাটি।

এই বার্তায় পৃথিবী, পৃথিবীর পরিবেশ ও প্রাণিজগৎ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যপূর্ণ বক্তব্য প্রেরণ করা হয়েছে। যেমন—পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলে যে সব উপাদান রয়েছে যথা—হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও ফসফরাসের এ্যাটমিক নাম্বারসমূহ। এছাড়াও দেয়া হয়েছে—পৃথিবীতে যে প্রাণী আছে তাদের দেহের জিনেটিক মেটেরিয়ালস-এর রাসায়নিক গঠনপ্রকৃতি। বিশেষ করে মানুষ সম্পর্কে পরিবেশিত হয়েছে একটি সংক্ষিপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

যেমন—মানুষ কি? এরা কি ধরনের প্রাণি? মানুষ নামের প্রাণীদের গড় উচ্চতা কত? পৃথিবীতে বসবাসরত এই জাতের প্রাণীদের সংখ্যা কত? অর্থাৎ মানুষ নামে পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় সাড়ে চারশো কোটি প্রাণী বিচরণ করছে।

এছাড়াও বর্ণনা করা হয়েছে—আমরা কোন সৌর জগতের প্রাণী। এখানকার আবহাওয়া কিরূপ? মানুষ নামের বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন এই প্রাণীরা মহাকাশে তাদের সহগোত্রীয় প্রাণিদের অনুসন্ধান করতে

গিয়ে যেসব যন্ত্র ব্যবহার করছে সেই রেডিও টেলিস্কোপেরও বর্ণনা করা হয়েছে এই বার্তায়।

রেডিও টেলিস্কোপের ট্রান্সমিশনে এই সংকেতটি বিশেষ কায়দায় বৈদ্যুতিক-আলোক তরঙ্গ সৃষ্টি করে পাঠানো হয়েছে। এই সংকেত এতো প্রচণ্ড আলোক তরঙ্গের সৃষ্টি করে যে তা পৃথিবীর সমস্ত বিদ্যুৎ একত্রিত করলেও তার একদশমাংশের সমকক্ষ হবে না। এই আলোক-তরঙ্গ এতো তীব্র যে—প্রায় সূর্যের চেয়েও একলক্ষ গুণ বেশী। বিজ্ঞানী ড্রাক বলেন,—মাত্র তিন মিনিটের জন্য এই সময় পৃথিবী গোটা গ্যালাক্সীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হয়ে যায়।

মহাকাশে প্রাণের সন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা যে শুধু রেডিও টেলিস্কোপ যন্ত্রই ব্যবহার করছেন তাই নয়। তাঁরা অন্যভাবেও চেষ্টা চালাচ্ছেন। এই সৌরজগতের বাইরে প্রাণের অস্তিত্ব জানার জন্য সেখানে রকেটও পাঠানো হচ্ছে।

যেমন,—গত ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে পাঠানো হয়েছে পাইও-নিয়ার—১০। এটি গত ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বৃহস্পতির কক্ষে, ১৯৭৭ সালে শনি গ্রহের কক্ষপথে, ১৯৮০ সালের ইউরেনাস এবং ১৯৮৩ সালে সৌরজগতের শেষ গ্রহ প্লুটোকে অতিক্রম করে যাত্রা করেছে অনন্ত মহাকাশের সীমাহীন পথে। মনুষ্য-তৈরি কোনো মহাকাশ যানের সৌরজগৎ অতিক্রম করার ঘটনা এটাই প্রথম।

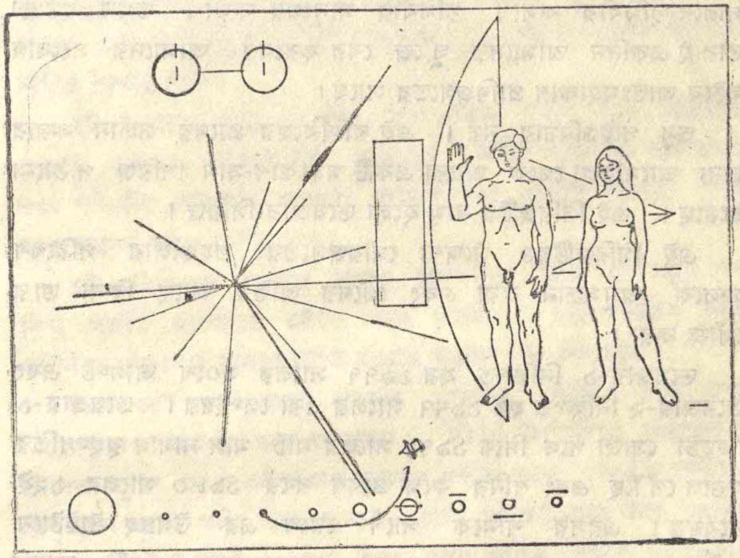
আমেরিকার এই পাইওনিয়ার মহাকাশযান সিরিজের আরো দু'টি উপগ্রহ আছে। এ দুটোর নাম হলো, পাইওনিয়ার-১১ এবং পাইওনিয়ার-১২। পাইওনিয়ার-১১ মহাকাশ যানটি ছাড়া হয় ১৯৭২ সালের ৫ই এপ্রিল তারিখে এবং পাইওনিয়ার-১২ মহাকাশ যানটি ছাড়া হয় ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে। এ দু'টিরও যাত্রা আজো অব্যাহত রয়েছে। তবে এরা এখনো সৌরজগৎ অতিক্রম করতে পারেনি।

এই সিরিজের প্রথম উপগ্রহটি সৌরজগৎ ছাড়িয়ে গেছে। এই উপগ্রহ তিনটির কথা এখানে উল্লেখ করার একটি কারণ আছে।

এই মহাকাশ-যানগুলো পাঠানোর অন্যতম উদ্দেশ্যও হলো সৌরগতের বাইরে প্রাণের অনুসন্ধান করা।

পাইওনিয়ার-১০ এর ভিতরেও পাঠানো হয়েছে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংকেত-বার্তা। একটি স্বর্ণ মিশ্রিত এলোমিনিয়াম পাতের উপর খোদাই করে দেয়া হয়েছে একটি চমৎকার সাংকেতিক ছবি। এই ছবিটিই হলো মহাকাশের অচেনা প্রাণীদের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর মানুষের বার্তা। এই ছবিটির প্রতিটি রেখাচিত্রই অত্যন্ত অর্থপূর্ণ।

চিত্রটির মাঝ বরাবর আঁকা হয়েছে দিক নির্ণয়ের রেখাচিত্র। তার এক পাশে দেখানো হয়েছে সূর্যের ছবি। তার পাশে দেখানো হয়েছে সৌরজগতের গ্রহগুলোর অবস্থান। পৃথিবী সৌরজগতের তিন নম্বর গ্রহ। এই তিন নম্বর গ্রহ থেকেই বেরিয়ে এসেছে এই পাইওনিয়ার-১০ উপগ্রহটি। এর গতিপথেরও একটি রেখাচিত্র দেখানো হয়েছে।



উপরের এই সাংকেতিক রেখাচিত্র বাণীটাই পাইওনিয়ার-১০ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে মহাকাশের অচেনা প্রাণীদের জন্য।

কিন্তু এই রেখাচিত্রটির সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হলো—পৃথিবীর প্রাণী—বিশেষ করে মানুষ নামের প্রাণীটির একটি প্রতীক ছবি। আঁকা হয়েছে একটি পুরুষ মানুষ এবং পাশে একটি মেয়ে

মানুষের পূর্ণাঙ্গ রেখাচিত্র। পুরুষের তুলনায় মেয়েরা কতখানি দৈহিক দিক দিয়ে খাটো তাও দেখানো হয়েছে। পাশের পুরুষটি তার ডান হাত উপরে তুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে ডাকে সাড়াদানের ভংগীতে।

এই তাৎপর্যপূর্ণ ছবিটি সাথে নিয়েই পাইওনিয়ার-১০ যাত্রা করেছে অনন্ত মহাকাশের পথে। তার গতি অব্যাহত রয়েছে। আরো বহু যুগ ধরে সে শুধু চলতেই থাকবে সামনের দিকে। চলা তার শেষ হবে না কখনো। এই যাত্রাপথে হয়তো তার সাথে সাক্ষাৎ হবে আরো বহু গ্রহ-নক্ষত্রের। যদি কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব থেকেই থাকে, তবে তারাও সন্ধান পাবে এই মহাকাশ যানটির। তারা তখন অনুসন্ধান করে দেখবে এটি এসেছে কোথা থেকে? সন্ধান পাবে এর ভেতরে পাঠানো মানুষের বার্তাটিরও। তখন জানতে পারবে পৃথিবীর কথা। পৃথিবীর মানুষের কথা। তখন হয়তো তারাই একদিন আমাদের খুঁজে বের করবে। আমাদের সংযোগ ঘটবে আন্তঃমহাকাশ প্রাণিজগতের সাথে।

শুধু পাইওনিয়ার নয়। এই বহির্বিশ্বের প্রাণের সন্ধান করার জন্য আমেরিকা থেকে আরো একটি মহাকাশ-যান সিরিজ পাঠানো হয়েছে। এই সিরিজটির নাম হলো ভয়েজার সিরিজ।

এই সিরিজটিরও উদ্দেশ্য সৌরজগতের গ্রহগুলোর পরিবেশ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা তার খোঁজ করা।

ভয়েজার-১ নিক্ষিপ্ত হয় ১৯৭৭ সালের ২০শে আগস্ট এবং ভয়েজার-২ নিক্ষিপ্ত হয় ১৯৭৭ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর। ভয়েজার-১ কিছুটা সোজা পথে গিয়ে ১৯৭৯ সালের মার্চ মাস নাগাদ বৃহস্পতির মণ্ডলে পৌঁছে এবং শনির কক্ষে প্রবেশ করে ১৯৮০ সালের ১২ই নবেম্বর। এরপর শনিকে পাশে রেখে এর উপগ্রহ টাইটানে পৌঁছে। এরপর তার গন্তব্যস্থল আরো দূরে। এটি আজো অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলছে সামনের দিকে। এদিকে ভয়েজার-২ এর গতিপথ কিছুটা দীর্ঘ। এটি বৃহস্পতির পরিমণ্ডলে পৌঁছে ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে। এটি শনির কক্ষে প্রবেশ করেছিলো গত ১৯৮১ সালের ২৭শে আগস্ট। তারপর ভয়েজার-২ শনির

পরিমণ্ডল ছাড়িয়ে ইউরেনাসের পথে পাড়ি দেয়। সেখানে পৌঁছায় গত ১৯৮৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে। এরপর পাড়ি দেবে নেপচুন গ্রহের দিকে। নেপচুন গ্রহের কাছাকাছি পৌঁছাবে ১৯৮৯ সালের সেপ্টম্বর মাসের দিকে।

বহির্বিশ্বে অজ্ঞাত সম্ভাব্য প্রাণীদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য এই ভয়েজার উপগ্রহের মধ্যেও পাঠানো হয়েছে সাংকেতিক বার্তা। এই ভয়েজার-১ ও ২তে আছে ৬০টি ভাষায় রচিত পৃথক পৃথক বার্তার ফটোগ্রাফী এবং পৃথিবীর পরিবেশ, মাটি, পাহাড়-পর্বত এবং প্রাণীদের উপর রয়েছে ১১৬টি বিভিন্ন ধরনের ছবি এবং দেড় ঘন্টার একটি টেপ রেকর্ডার। এই রেকর্ডারে ধরা আছে পৃথিবীতে বিদ্যমান বিভিন্ন রকম ধ্বনি। অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষের গলার শব্দ, সংগীত, বাজনা, ঝড়ের শব্দ, সুমদ্রের শব্দ ইত্যাদি বিচিত্র শব্দের রেকর্ড।

এই ধরনের ছবি, ভাষার সাংকেতিক চিহ্ন এবং মিউজিক থেকেই হয়তো বহির্বিশ্বের বুদ্ধিমান প্রাণীরা পৃথিবীর প্রাণিজগৎ তথা পৃথিবীর পরিবেশ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারবে, সৃষ্টি হবে তাদের সাথে যোগাযোগ।

এই বহির্জগতে প্রাণের সন্ধান করা নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে বেশ কিছু মজার ব্যাপারও ঘটতে শুরু করেছে। এই কার্যক্রম নিয়ে পৃথিবীর মানুষের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে অনেক তর্ক বিতর্কের।

কেউ এই কার্যক্রমকে সমর্থন করছেন, আবার কেউ কেউ বিরোধিতাও করতে শুরু করেছেন। যাঁরা বিরোধিতা করছেন— তাঁদের যুক্তি হলো বহির্জগতে প্রাণের সন্ধান করে পৃথিবীর মানুষের কি এমন আহা মরি লাভ হবে? এতে লাভের চেয়ে বরং লোক-সানের ভয়টাই বেশী। এতে বরং প্রচুর ক্ষতির সম্ভাবনাও থাকতে পারে।

—কি ক্ষতি হবে?

এর উত্তরে তাঁরা বলেছেন,—হয়তো বহির্বিশ্বের প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেলো। এমন যদি হয় সেই প্রাণীরা মানুষের ভক্ষ্য। তাহলে তো ভালোই হবে। তাদের ধরে এনে খাওয়া যাবে। কিন্তু এমন যদি হয় যে তাদের কাছে আমরা নিজেরাই খাদ্যবস্তু, তখন

কেমন হবে? অথবা এমনও হতে পারে ভিন্ন গ্রহের প্রাণীরা পৃথিবীর মানুষের মতোই প্রায় আকৃতি বিশেষ, তবে শতগুণ বেশি বুদ্ধিমান। তখন তারা হয়তো পৃথিবীর মানুষকে ধরে নিয়ে দাসে পরিণত করবে। মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে। গোটা পৃথিবীটাকে তারা বানিয়ে ফেলবে উপনিবেশ। তখন পৃথিবীর মানুষের দুঃখের যে আর শেষ থাকবে না।

তাই এমন খাল কেটে কুমীর ডেকে আনার কি প্রয়োজন? মহাকাশের আর কোথায় প্রাণী আছে কিনা আছে তা দিয়ে আমাদের কোনো দরকার নেই। তাদের মতে তারা থাকুক, আমরা থাকি আমাদের সুখ-দুঃখ নিয়ে।

কিন্তু যারা সমর্থন করেন—তাঁদের যুক্তি আবার এসবের সম্পূর্ণ উল্টো। সমর্থনকারীরা বলেন.—বহির্বিশ্বে প্রাণের সন্ধান করলে লাভ ছাড়া লোকসান তো কিছু নেই। যদি এমনও হয়, এই অনুসন্ধান সত্যি সত্যি ব্যর্থ হয়ে গেল, বহির্বিশ্বে সত্যি সত্যি কোনো প্রাণের সন্ধান পাওয়াই গেলো না, তাতেও দুঃখ করার কিছু নেই। সেখানেও আমাদের পরোক্ষভাবে লাভ একটা হচ্ছেই।

এই পরোক্ষ লাভটা হলো—পৃথিবীর মানুষের কারিগরি জ্ঞানের উৎকর্ষতা লাভ। মানুষ মহাকাশের দূর থেকে দূরান্তরে সংকেত পাঠানো, রকেট পাঠানো এবং তাকে আরো বেশী সুষ্ঠু সুন্দর করার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছে। এর ফলে আবিষ্কৃত হচ্ছে নিত্য নতুন নতুন যন্ত্রপাতি। সেগুলো এই গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তো বটেই—তদুপরি সেগুলো মানুষের নিজস্ব প্রয়োজনেও লাগছে। ব্যবহার করা যাচ্ছে মানুষের কল্যাণে। সেটা কি মানুষের জন্য লাভের ব্যাপার নয়? চুপকরে বসে থাকলে কি মানুষ এসব উন্নতমানের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করতে পারতো? এই গেলো লাভের একদিক।

আর যদি মহাকাশে কোথাও না কোথাও প্রাণের সন্ধান পাওয়াই যায়, তা হলেই বা ভয় পাবার কি আছে? হলোই বা তারা আমাদের চেয়ে হাজারগুণ বেশী বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান হলেই যে তারা বেশি দুষ্ট হবে এমন কোনো কথা আছে? তারা তো আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান এবং বেশী সভ্য ও ভদ্রও হতে পারে—তখন তাদের

সংস্পর্শে এসে আমরাও হয়তো রাতারাতি অনেক বেশী বুদ্ধিমান হয়ে যেতে পারবো।

তাদের কাছে শিখবো উন্নতমানের কারিগরি বিদ্যা, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সভ্যতা। সেটা কি পৃথিবীর মানুষের জন্য একটা মস্ত বড় সৌভাগ্যের বিষয় হবে না?

তাই এই গবেষণা বন্ধ করা চলবে না। গবেষণা চলবেই। সন্ধান করতেই হবে বিশ্বে কোথায় আছে আমাদের সাথীরা। আমরা তাদের বন্ধু হতে চাই।

মার্চ, ১৯৮২

গ্রহান্তরের আগন্তুক

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই মানুষকে একটা বিষয় খুব ভাবিয়ে তুলতে শুরু করেছে। মানুষকে মানে—পৃথিবী নামের গ্রহটিতে আমরা মানুষ নামের যে প্রাণীরা বাস করছি, তাদেরকে। আর ওই যে ভাবনার কথাটা বললাম,—এই ভাবনাটাও হলো তাদের নিজেদের নিয়েই। নিজের সগোত্রীয়দের নিয়েই। গোটা সৌর-জগতে আর কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব নেই।

কিন্তু মহাকাশটা তো শুধু সৌরজগৎ নিয়ে নয়। কূলহীন, কিনারাহীন মহাকাশের কাছে সৌরজগৎ তো একেবারেই ক্ষুদ্র। হয়তো এমন কোটি কোটি সৌরজগৎ ছড়িয়ে আছে মহাকাশের কত আনাচে কানাচে।

এই কোটি কোটি সৌরজগতের কোথাও না কোথাও মানুষ থাকতেই পারে। বিজ্ঞানীদের এটা দৃঢ় বিশ্বাসও। এমনও হতে পারে তারা আমাদের চেয়েও হাজারগুণ বেশি বুদ্ধিমান এবং উন্নত। তবে মানুষ যে আছেই এমন কোনো সঠিক তথ্য অবশ্য আজো পাওয়া যায়নি। কিন্তু প্রমাণ পাওয়া না গেলেও অনুমানের ভিত্তিটাও কম শক্ত নয়। মহাকাশে খোঁজাখুঁজির কথা ছেড়েই দিলাম। অনুমান-গুলোকে যদি পৃথিবীর মাটিতেও ছেড়ে দেয়া যায়--তাহলেও কম বিস্ময় সৃষ্টি করেনা।

এই আমাদের পৃথিবীর মাটিতেই এমন কিছু কিছু বিস্ময়কর জিনিস ছড়িয়ে আছে যা দেখলে সত্যি বিস্মিত হতে হয়। পৃথিবীর বিবর্তন ধারার ইতিহাসের সাথে একেবারেই তা খাপ খায় না।

পৃথিবীতে প্রাণী এসেছে কয়েক কোটি বছর আগে। মানুষ এসেছে--আরো অনেক পরে। মানুষের বয়স বড় জোর সত্তর আশি লাখ বছর। কিন্তু মানুষের সভ্যতা এসেছে আরো পরে। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস দশ বিশ হাজার বছরের বেশি নয়।

পৃথিবীর বেশ কিছু জায়গা থেকে এমন বিস্ময়কর কিছু কিছু জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে বা হচ্ছে যেগুলোর বয়সও দশ বিশ হাজারের

মতো। কিন্তু সেগুলো এমনই চমৎকার সভ্যতার নিদর্শন যে, অত যুগ আগে সৃষ্টি হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। তা হলে এগুলো সৃষ্টি করলো কে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই আজ মানুষ ভাবতে শুরু করেছে। নিশ্চয়ই এগুলো পৃথিবীর মানুষের তৈরি নয়। নিশ্চয়ই পৃথিবীর বাইরে থেকে অনেক বুদ্ধিমান প্রাণীরা এসে এগুলো তৈরি করে গেছে। হয়তো মহাকাশের কোথাও না কোথাও উন্নত সভ্যতার মানুষ আছে। তারা সুদূর অতীতে পৃথিবীতে আসতো। পৃথিবীর মানুষের সাথে মিশতো। মানুষকে শিক্ষা দিতো উন্নত কারিগরি জ্ঞান। এই যে বিস্ময়কর জিনিসগুলো এগুলো হয়তো তারই নিদর্শন।

॥ ২ ॥

মিশরের পিরামিডের কথাই ধরা যাক। মিশরের পিরামিড সত্যি এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যে ঘেরা। কেমন করে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে এগুলো নির্মিত হয়েছিলো, তা সঠিক করে কেউ বলতে পারে না। সভ্যতার সেই ঊষালগ্নে এমন বিস্ময়কর কারিগরি জ্ঞান মানুষ কোথা থেকে পেয়েছিলো—সে এক মস্ত গোলক ধাঁধাঁ। পিরামিডগুলোর নির্মাণ কৌশল এমন চমৎকার ও বিস্ময়কর যে,—তার রহস্য মানুষ আজো উদ্ধার করতে পারেনি।

বিশাল বিশাল পাথর কেটে একটার সাথে অন্যটা জোড়া দিয়ে এক অদ্ভুত কায়দায় তৈরি করা হয়েছে এই পিরামিডগুলো। কিন্তু বিস্ময় হলো,—সভ্যতার সেই ঊষালগ্নে যখন আদিম মানুষের হাতে কোনো উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ছিলো না, তখন অমন বড় বড় কয়েক টন ওজনের এক একটি পাথরের চাঙড় ওরা অমন উঁচুতে তুলতো কেমন করে?

কেউ কেউ বলেন,—ওগুলো হয়তো প্রাচীন মিশরীয়রা কাঠের রোলারের উপর চাপিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে উপরে তুলেছিলো। কিন্তু অমন বিশ পঁচিশ টন পাথরের চাঁই চাপানোর মতো কাঠ কোথায় পেয়েছিলো তারা? সারা মিশরে একমাত্র খেজুর গাছ ছাড়া আর

কোনো গাছই নেই বলতে গেলে। তাহলে কেমন করে সম্ভব ? কেউ বলেন, হয়তো এই কাজের জন্য বড় বড় গাছের গুঁড়ি বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়েছিলো। কিন্তু সেখানেও তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। তা হলে কেমন করে সম্ভব হয়েছিলো ? তা হলে কি পৃথিবীর মানুষের চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমান কোনো প্রাণীরা একাজগুলো করে দিয়ে গিয়েছিলো ? তারা কি কোনো ভিন্ গ্রহের মানুষ ?

সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে বিস্ময়কর পিরামিডটি হলো ফারাও খুফুর পিরামিড। গ্রীক ভাষায় এর নাম হলো 'শিঅপস্'। এই শিঅপস্ পিরামিডটি নির্মিত হয়েছিলো প্রায় সাড়ে চার হাজার খ্রীস্ট পূর্বাব্দে।

মিশরের গিজা অঞ্চলের এক সমতল ভূমিতে তের একর জায়গা জুড়ে নির্মিত হয়েছে এই বিশাল পিরামিড।

এর গঠন প্রকৃতি আর বিশালত্ব সত্যি বিস্ময়কর। এটি তৈরি করতে প্রায় পঁচিশ লাখ পাথরের দরকার হয়েছিলো। যার এক একটি পাথরের ওজন ছিলো প্রায় পঁচিশ টন করে। এটি উচ্চতায় চারশো একাশি ফুট (প্রায় চল্লিশ তলা ভবনের সমান)। প্রশ্ন হলো,—সেই সেকালে কোনোরূপ উন্নত যন্ত্রপাতি ছাড়াই কেমন করে পঁচিশ টন ওজনের পাথর খণ্ডকে পাঁচশো ফুট উপরে তোলা সম্ভব হয়েছিলো।

পাথর খণ্ডগুলোকে একটার সাথে অন্যটা এমন চমৎকার করে মিশিয়ে লাগানো হয়েছে যে, দুটো পাথরের ফাঁক দিয়ে একটি পাতলা কাগজ পর্যন্ত ঢুকানো যায় না। এমন নিখুঁত কাজ।

শিঅপস্-এর গঠনকৌশল সব দিক দিয়েই বিজ্ঞানীদের অবাক করে দিচ্ছে। যেমন, এর উচ্চতার সাথে দশ-এর পর আটটি শূন্য বসিয়ে দিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তা দিয়ে গুণ করলে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব পাওয়া যায়। অর্থাৎ নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল হয়। পিরামিডের মোট ওজনের (আনুমানিক-৩,১২,০০,৫০০ টন) সাথে ১০ গুণ করলে পৃথিবীর ওজন পাওয়া যায়। পিরামিডের পরিসীমাকে উচ্চতার দ্বিগুণ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় গণিত শাস্ত্রের একটি বিখ্যাত সংখ্যা 'পাই'। পিরামিডের প্রকৃতি থেকে

পাওয়া এই 'পাই'-এর মান হলো—৩.১৪১৫৯। উল্লেখ্য যে, এই সংখ্যাটি আধুনিক কম্পিউটার এই মাত্র কিছুদিন আগে বের করতে সক্ষম হয়েছে।

পিরামিডটির মাঝখান দিয়ে একটা মধ্য রেখা টানা হলে ওটা মহাদেশ ও মহাসাগরগুলোকে সমান ভাগে ভাগ করে দেয়।

পিরামিডের ভিতরের অন্ধকার কক্ষগুলো কিভাবে আলোকিত করা হতো—তা আজো বিস্ময়ের বিষয়। মশাল কিংবা আগুন জ্বেলে আলোকিত করার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। কিন্তু যে নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা বিস্ময়কর। পাথরের গায়ে খোদাই করা এক ধরনের যন্ত্র পাওয়া গেছে, যার সাথে আধুনিক বৈদ্যুতিক বাতির প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে। এমনকি খোদাইতে বৈদ্যুতিক তারটিকে পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। কিন্তু তখনো তো বিদ্যুতই আবিষ্কৃত হয়নি।

তাহলে প্রশ্ন হলো,—মিশরের পিরামিডের এই উন্নতমানের কারিগরি কৌশল যা এই বিংশ শতাব্দীর মানুষকে হতবাক করে দেয়—এই মানের কলাকৌশল সেই হাজার হাজার বছর আগের মানুষ কেমন করে আয়ত্ত করেছিলো? জ্ঞান-বিজ্ঞানে কি মানুষ তখনি এতো উন্নত ছিলো? নাকি অন্য কোনো গ্রহের উন্নত জ্ঞানের অধিকারী প্রাণীরা এসে তাদের এটা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলো।

পিরামিডের বিস্ময় শুধু এর গঠনকৌশলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গঠন কৌশল ছাড়াও এর মধ্যে এমন আরো কিছু কিছু রহস্য রয়েছে যা রীতিমতো ভৌতিক ব্যাপারের মতো। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান পর্যন্ত যেখানে খেই হারিয়ে ফেলেছে।

যেমন—পিরামিডের ভিতরে কোনো কাঁচা জিনিস বা মৃত কোনো প্রাণীর দেহ রেখে দিলে তা পঁচে যায় না। শুকিয়ে হয়তো নীরস হয়ে যায়, কিন্তু তা পঁচে দুর্গন্ধ হয় না। ওগুলো কৃত্রিম মমি হয়ে যায়। এই অত্যাশ্চর্য বিষয়টি নিয়ে অনেক বিজ্ঞানী নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষাও করেছেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন—বিখ্যাত রেডিও ইঞ্জিনিয়ার ডঃ ক্যারল ডরব্যাল। তিনি মনে করেন পিরামিডের ভিতর এমন একটি অদৃশ্য রহস্যজনক শক্তি

আছে যা পচন ক্রিয়াকে রোধ করে। তিনি এই রহস্যময় অদৃশ্য শক্তির নাম দিয়েছেন "পিরামিড পাওয়ার"।

ক্যারলের ধারণা হলো,—পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্র এবং কস্‌মিক রশ্মির এক ধরনের সূক্ষ্ম তরঙ্গ পিরামিডের ভিতরে এক রহস্যময় অদৃশ্য রশ্মি সৃষ্টি করে। এই অদৃশ্য রশ্মিই এত সব ভৌতিক কাণ্ড ঘটায়।

'ব্যাসিলাস ক্লস্ট্রিডিয়াম বোটুলিনাম' নামে এক প্রকারের জীবাণু জন্ম নেয় বাসি বা পচা মাছ মাংস বা খাদ্যের মধ্যে। এর ফলে পচন ধরে। কিন্তু অবাক কাণ্ড—পিরামিডের তলায় শুকনো মাংসে এই জীবাণু জন্মাতে পারে না।

আশ্চর্য ব্যাপার হলো—এমন রহস্যময় জিনিস আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে কেমন করে তৈরি করলেন সে যুগের মানুষেরা—যার রহস্য বিজ্ঞানীরা আজো ভেদ করতে পারেননি।

॥ ৩ ॥

এই মিশরীয় পিরামিডের মতোই পৃথিবীতে এমন আরো অনেক রহস্যময় জিনিস আছে—যার নির্মাণকৌশলও আজো মানুষের ধারণায় আসে না। মানুষ আজো বিশ্বাস করতে পারে না—আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে এমনটা তৈরি হয়েছিলো কেমন করে?

১৫১৩ সালে দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে পাওয়া গেছে বহু প্রাচীন একটি পৃথিবীর মানচিত্র। হালকা রঙের হরিণের চামড়ার উপর আঁকা পৃথিবীর মানচিত্র।

বেশ কয়েকটি হাত ফেরতা হয়ে ১৫১৫ সালে মানচিত্রটি পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরে অবস্থানরত তুরস্কের নৌবাহিনীর অধিনায়ক দীন পীরি রইসের হাতে পড়ে। তিনি প্রায় কুড়িখানা বিভিন্ন পুরনো ম্যাপের টুকরো একত্রিত করে তৈরি করেন একটি পূর্ণাঙ্গ ম্যাপের নকল। পীরি রইস শুধু প্রাচীন মানচিত্রগুলো একটার সাথে অন্যটা জোড়া দিয়েছিলেন--বিকৃত করেননি।

পরে তিনি ১৫১৭ সালে মিশর বিজেতা সেনাপতি সেলিমকে এটি উপহার দেন। সেখান থেকে আরো কয়েক হাত ঘুরে অবশেষে

১৯৫৪ সালে মানচিত্রটি পৌঁছায় মার্কিন বিখ্যাত মানচিত্রকর আর্লিংটন এইচ. ম্যালারীর কাছে।

এই মানচিত্রটি দেখে মানচিত্র বিশেষজ্ঞ ম্যালারী যারপর নাই বিস্মিত হয়ে যান। মানচিত্রটিতে এমন কিছু কিছু স্থানের ছবি আঁকা হয়েছে, যে জায়গাগুলো মানচিত্রটি তৈরি হবার সময় পর্যন্ত আবিষ্কৃতই হয়নি। তাহলে এর মানচিত্র এলো কেমন করে? ভারী গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে গেলেন তিনি। অবশেষে মানচিত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখার জন্য তিনি পাঠালেন মার্কিন সমুদ্রবিজ্ঞান (Hydrography) সংস্থায় কর্মরত তঁরাই সহকর্মী থিঃ ওয়ালটার্সের কাছে। ওয়াল্টার্স খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলেন মানচিত্রটি।

পরীক্ষা করে তিনি বললেন যে,—এটি একটি নিখুঁত মানচিত্র। এই মানচিত্রে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ অমেরিকার পর্বতমালা, নদ-নদী, হ্রদ ও দ্বীপসমূহের যে অবস্থান আঁকা হয়েছে তা একেবারে নির্ভুল।

তাঁরা ব্যাপারটাকে আরো নিখুঁতভাবে জানার জন্য মানচিত্র দুটোকে এবার স্থাপন করলেন আধুনিক ভূ-গোলকের উপর। এবার আরো বিস্মিত হলেন। দেখা গেলো, শুধু উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাই নয়, দক্ষিণ মেরু এবং উত্তর মেরুর সীমারেখা পর্যন্ত মিলে যাচ্ছে হুবহু। সর্ব দক্ষিণের সংকীর্ণ ভূ-ভাগ, যেটা টিয়েরাডেল ফুয়েগা অঞ্চল থেকে বের হয়ে চওড়া হতে হতে দক্ষিণ মেরুর সাথে মিশেছে। এখন বর্তমানে টিয়েরাডেল ফুয়েগার দক্ষিণাংশে রয়েছে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালারসমুদ্র। অতি সম্প্রতি আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রতিধ্বনির মারফত সাগর তলের ছবি তোলা হয়েছে। আকাশ থেকে ইনফ্রা-রেড আলো ফেলে এর ছবি তোলা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো সর্বাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে তোলা ছবির সাথে প্রাচীন মানচিত্রগুলো অবিকল মিলে যাচ্ছে।

আজ থেকে বারো হাজার বছর আগে অর্থাৎ তুষার যুগের শেষের দিকে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণাংশ দক্ষিণ মেরুর সাথে সংযুক্ত ছিলো।

মার্কিন নৌবাহিনীর মানচিত্রকর ফাদার লাইন হ্যাম এই মানচিত্রগুলো সম্পর্কে বলছেন,—মানচিত্রে কুমেরু অঞ্চলের যে ছবি আঁকা

হয়েছে তা অবিশ্বাস্য রকমের নিখুঁত। এর মধ্যে এমন সব তথ্য রয়েছে যা ১৯৪৯ এবং ১৯৫২ সালের নরওয়ে-সুইডেন এবং বৃটেনের যৌথ ভৌগোলিক অভিযান চালানের আগে পর্যন্ত মানুষে জানতেই পারেনি।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন—নিশ্চয়ই বরফে ঢেকে যাওয়ার আগেই এই কুমেরু অঞ্চলের ছবি আঁকা হয়েছিলো। বর্তমানে এই অঞ্চলের গোটাটাই প্রায় পুরু বরফে ঢাকা পড়ে আছে। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো—এই ছবিগুলো তোলা হয়েছিলো আকাশ থেকে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে মানুষ বিমান পেলো কোথায়? তারা আকাশে উড়লো কেমন করে? তবে কি অন্য কোনো গ্রহের মানুষেরা তুলে দিয়ে গিয়েছিলো এই ছবি? তাদের মহাকাশ যান থেকে তোলা এই নিখুঁত ছবি?

॥ ৪ ॥

এমনি আরো একটি বিস্ময় ছড়িয়ে আছে আন্দিজ পর্বতমালার পেরুর অংশে। এখানে আছে নাজকা নামে একটি ছোট্ট শহর। এই শহরের কাছ ঘেঁষেই পাল্‌পা উপত্যকা। এখানে আছে একটি সমতল ভূমি। সমতল ভূমিটি লম্বায় উনষাট কিলোমিটারের মতো এবং চওড়ায় দেড় কিলোমিটার। এই বিশাল সমতল ভূমিতেই ছড়িয়ে আছে হাজারো রকমের বিস্ময়।

এই সমতল ভূমিতে ছড়িয়ে আছে রহস্যময় জ্যামিতিক পদ্ধতিতে আঁকা বিশাল বিশাল কিসব রেখা। বিমান থেকে দেখলে নাজকার এই রেখাগুলোকে ঝিক্‌মিক করতে দেখা যায়। কিলোমিটারের পর কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে আছে এই রহস্যময় রেখা। রেখাগুলো কোথাও সমান্তরাল, কোথাও পরস্পরছেদী, কোথাও আকার নিয়েছে চতুর্ভুজের। এক একটি বাহু প্রায় আটশো গজের মতো। সোজা রেখাগুলোর মাঝখানে আছে জীবজন্তুর বিশাল বিশাল নক্‌শা।

এই বিচিত্র নক্‌শাগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৩০ সালের পর। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রেখাগুলো নিয়ে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ মারিয়া রাইশ ১৯৪৬ সালে কয়েকবার জরিপ করে দেখেছেন। এমনকি এর উপর তিনি "Secret of the desert" নামে একটি বইও লিখেছেন।

এই রেখাগুলো নিয়ে গবেষণা করতে করতে মারিয়া রাইশ বার বার যে প্রশ্ন করেছেন, তা হলো—এই বিচিত্র আর বিশাল রেখাগুলো অত প্রাচীনকালে কে এঁকে গেছে? নক্‌শাগুলো দেখলেই বোঝা যায়—যারা এগুলো এঁকেছে তাদের নিশ্চয় উঁচুদরের জরিপ কৌশল জানা ছিলো। ছবিগুলো একেবারে নিখুঁত এবং নিপুণ হাতে আঁকা।

প্রথমে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেছিলেন—এই বিচিত্র রেখাগুলো হয়তো প্রাচীন ইংকাদের রাস্তা আর না হয় সেচ প্রণালী হবে। কিন্তু পরক্ষণেই এই ভুল ধরা পড়েছে, সেচ প্রণালী কিংবা রাস্তা হলে অমন হঠাৎ করে এর শুরু হবে কেনো আর হঠাৎ করেই বা অমন শেষ হবে কেনো? আর রাস্তা হলে তা অমন করে পরস্পর ছেদই বা করবে কেনো?

মারিয়া রাইশ মনে করেন—এই রেখাগুলোর হয়তো কোনো ধর্মীয় ব্যাখ্যা আছে। আর না হয় এগুলো কোনো বিশেষ ধরনের পঞ্জিকার সাংকেতিক রেখা।

প্রত্নতত্ত্ববিদ দানিকেন মনে করেন,—এগুলো হয়তো পৃথিবীর কোনো মানুষেরই আঁকা চিত্র নয়। হয়তো ভিন্‌গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীরা এসে এগুলো তৈরি করেছিলো, তাদের নিজেদের প্রয়োজনে। তারা হয়তো এখানেই তৈরি করেছিলো তাদের মহাকাশ-যান নামার স্থান। বোঝা যায় রেখাগুলোর উপরের লোহার পাত বসানো ছিলো। এখন তা নেই, শুধু মরচের দাগ আছে।

এই পেরুরই শাকশাইহু আমান নামে একটি পাহাড়ের কাছে আবিষ্কৃত হয়েছে আরো একটি বিরাট বিস্ময়। এখানে আছে একটি অতি প্রাচীন কালের দুর্গ। প্রায় দেড় হাজার ফুট লম্বা এবং চুয়ান্ন হাজার ফুট চওড়া এই দুর্গটি কে যে তৈরি করেছিলো? কেউ বলে—এটি হয়তো প্রাচীন ইংকাদের তৈরি। এই দুর্গের পাঁচিল তৈরি করা হয়েছে এক একটি একশো টন ওজনের আস্ত পাথর দিয়ে দিয়ে। সেই প্রাচীন যুগে কোন রকম যান্ত্রিক সুবিধা ছাড়াই কেমন করে এই অসাধ্য সাধন করেছিলো ইংকারা?

কিন্তু এর চেয়েও আরেকটি বিরাট বিস্ময় রয়েছে—এই ইংকাদের দুর্গ থেকে মাত্রই কয়েকশো গজ দূরে শাকশাইহু আমান পাহাড়ের উপরে। এই পাহাড়ের গায়ের কয়েক শত ফুট উপরের ঢালু গর্তে

বসানো আছে আস্ত একটি বিশাল প্রস্তরখণ্ড। যার ওজন কম করে হলেও প্রায় বিশ হাজার টন হবে।

এটি দেখতে প্রায় চারতলা বাড়ীর সমান উঁচু। এই প্রচণ্ড প্রস্তর খণ্ডটিকে খনি থেকে কেটে তুলে এনে এখানে এমন করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাথরটিতে খোদাই করে উপরে উঠার সিঁড়ি বানানো হয়েছে। বিচিত্র আকৃতির ঘোরানো প্যাঁচানো প্যাঁচানো সব সিঁড়ি।

মজার সব ব্যাপার হলো, এই বিশাল প্রস্তরখণ্ডটি বসানো হয়েছে উল্টো করে। ফলে সিঁড়িগুলো উল্‌টো হয়ে আছে নীচের দিকে।

কিন্তু এখানে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো—এ বিশাল আকৃতির বিশ হাজার টন ওজনের অমন আস্ত একটি পাথর খণ্ডকে কেমন করে অমন শত শত ফুট উপরে তোলা সম্ভব হয়েছিলো ? শুধু কায়িক পরিশ্রম দিয়েতো এটা সম্ভব নয়। এমনকি এই সভ্যতার যুগেও বিশ হাজার টন একটি পাথরখণ্ডকে অমন শত শত ফুট উপরে তোলার মতো শক্তিশালী ক্রেন তৈরি হয়নি। তাহলে কোন্ মহাশক্তি করেছিলো এই অসাধ্য সাধন ? প্রাচীনকালের কোনো মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব তাতো বিশ্বাসই করা যায় না।

তাহলে বলতেই হবে যে এটা পৃথিবীর মানুষের কাজ নয়। নিশ্চয়ই সেই সুদূর অতীতে ভিন গ্রহের উন্নত প্রাণীরা এসেছিলো এই পৃথিবীতে। তারাই উন্নত যান্ত্রিক শক্তির বলে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে তৈরি করেছিলো এই আজব প্রস্তরখণ্ডটি।

॥ ৫ ॥

এবার বলি একটি বিচিত্র দ্বীপের কথা। দক্ষিণ আমেরিকার চিলির উপকূল থেকে প্রায় তিন হাজার ছয়শো কিলোমিটার দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একটি নির্জন দ্বীপ। দ্বীপটির নাম হলো 'ইস্টার দ্বীপ'। এর আরো একটি নাম আছে 'পক্ষীমানবের দেশ'।

এই ইস্টার দ্বীপেও পেরুর মতোই আছে অনেকগুলো বিশাল বিশাল পাথরের মূর্তি। যার এক একটি ত্রিশ বত্রিশ ফুট থেকে পঁয়ষট্টি সত্তর ফুট পর্যন্ত লম্বা আর পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত চওড়া। এমন বিশাল আকৃতির শত শত মূর্তি আছে এই দ্বীপে।

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো—সভ্যজগৎ থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে সেই সুদূর প্রাচীনকালে কারা তৈরি করছিলো এই বিস্ময়কর মূর্তিগুলো? ইস্পাতের মতো কঠিন শিলা কুঁদে কি করে তারা তৈরি করছিলো এগুলো?

দ্বীপটি যে একেবারে নির্জন তা অবশ্য বলা যায় না। বর্তমানে কয়েকশো লোক বাস করছে সেখানে। তবে এখনো আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়া লাগেনি। তা হলে সেখানকার মানুষের পক্ষে সেই প্রাচীনকালে কি এমন কাজ করা সম্ভব হয়েছিলো?

দ্বীপটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিলো ১৭২২ সালে। তারপর আঠারো শতকের প্রথম দিকে ইউরোপ থেকে একটি অভিযাত্রীদল প্রথম এই দ্বীপে আসেন। তাঁদেরই চোখে ধরা পড়ে এই বিস্ময়কর মূর্তিগুলো।

বিখ্যাত ব্যক্তিগণ যাঁরা এই দ্বীপে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কন্‌টিকি আভিযানের অধিনায়ক ও প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ মিঃ থর হেয়ারডাল এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ দানিকেন। মিঃ হেয়ারডাল এই বিস্ময়কর মূর্তিগুলো নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন।

যেমন—মূর্তিগুলো তৈরি করা হয়েছে দ্বীপের রারাকু আগ্নেয়গিরির শিলা থেকে। অত্যন্ত কঠিন এই শিলা। যেখানে খনি সেখানে এবং তার আশে পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক পাথরের তৈরি যন্ত্রপাতি। কিন্তু পাথরের ঐসব যন্ত্রপাতি দিয়ে এই শক্ত পাথর এতো মসৃণ করে কাটা মোটেই সম্ভব নয়। দানিকেন এমন একটা পরীক্ষাও করেছিলেন। স্থানীয় লোকদের সাহায্যে সেই পাথরের যন্ত্র দিয়ে ওই রারাকু আগ্নেয়গিরির শিলা কাটার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে অমানুষিক পরিশ্রম করে ওরা ওই পাথরের যন্ত্র দিয়ে কঠিন শিলার গায়ে মাত্র কয়েক ইঞ্চির বেশী গভীর দাগ কাটা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি। এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে সেই প্রাচীন কালে এই পাথরের মূর্তি তৈরি যারা করেছিলো নিশ্চয়ই তাদের হাতে ছিলো অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি? কিন্তু কারা তাঁরা? নিশ্চয়ই দ্বীপের অনুন্নত মুষ্টিমেয় লোক নয়।

মূর্তিগুলোর মধ্যে আরো কিছু বিস্ময় আছে। এই মূর্তিগুলোর প্রত্যেকটির পায়ের কাছেই বসানো আছে একটি করে টুপি। যেনো মাথার টুপিটা পায়ের কাছে রেখে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিগুলো।

তবে এখানে আরো একটি কথা হলো মূর্তিগুলো যে পাথর দিয়ে তৈরি টুপিগুলো সে পাথর দিয়ে তৈরি নয়। টুপিগুলো তৈরি করা হয়েছে এক বিশেষ ধরনের লালচে পাথর দিয়ে। মনে হয় লাল-মাটি আর কাকড় মিশিয়ে ঢালাই করে তৈরি করা হয়েছিলো ভঙ্গুর টুপিগুলো।

বিজ্ঞানীদের বিস্ময় হলো, এই বিদ্ঘুটে ধরনের মূর্তিগুলোর মাথায় আবার এই টুপি পরানোর সখ হয়েছিলো কেনো? তাহলে কি এই টুপিগুলো নভোচরদের শিরস্ত্রাণের প্রতীক?

এই দ্বীপে অতি প্রাচীন কিছু লিপিরও সন্ধান পাওয়া গেছে। লিপি-গুলো কাঠের ফলকের উপর লেখা। আজো এর পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। একেবারেই দুর্বোধ্য লিপি। এই লিপিতে আছে নানা ধরণের নকশা। এই নকশায় আছে নানা বিচিত্র জীবজন্তুর ছবি, মাছের ছবি, সূর্য ও চন্দ্রের ছবি ইত্যাদি।

বিজ্ঞানীরা এই বিচিত্র এবং দুর্বোধ্য লিপির পাঠোদ্ধার করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। যদি সত্যি সত্যি পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় তাহলে হয়তো ইস্টার দ্বীপের এই মূর্তি তৈরির রহস্যও উন্মোচিত হবে।

এখানে আরো একটি বিস্ময়কর বিষয় হলো—দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে পাওয়া বিশাল প্রস্তরখণ্ড আর এই প্রশান্ত মহাসাগরের নির্জন দ্বীপ ইস্টার আইল্যাণ্ডের মূর্তিগুলোর মধ্যে অদ্ভুত একটা মিল আছে। কিন্তু ওই সাদৃশ্য হলো কেমন করে? পেরুর সাথে এই ইস্টার দ্বীপের দূরত্ব কয়েক হাজার কিলোমিটার। সেই প্রাচীনকালে যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় ছিলো না বললেই চলে। কেমন করে এক দেশের মানুষ হাজার হাজার কিলোমিটার সমুদ্র পথ পাড়ি দিয়ে আরেক দেশে যেতে পেরেছিলো? তাহলে মিলের মূল রহস্য কোন-খানে? নাকি ভিন গ্রহের কোন প্রাণীদের দ্বারা তৈরি বলেই মূর্তি-গুলো একই রকমের হয়েছে?

॥ ৬ ॥

এমনি আর এক বিস্ময় হলো মায়া সভ্যতা। এই মায়ারা এমন এক বিস্ময়কর নির্ভুল পঞ্জিকা তৈরি করে গেছে যা চার কোটি বছরেও পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়বে না।

এই মায়া সভ্যতা অতি প্রাচীন সভ্যতা। প্রায় ছয়-সাত হাজার বছরের পুরনো এই সভ্যতা। কিন্তু সভ্যতার সেই আদিকালেই মায়ারা জ্ঞান বিজ্ঞানে এমন বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করেছিলো কেমন করে, তা ভাবতেও অবাক লাগে।

এদের বাসস্থান ছিলো আজকের গুয়াতেমালা এবং য়ুকাটানের জঙ্গলে। এখানেই আদিকালের মায়া জাতি গড়ে তুলেছিলো তাদের সভ্যতা। তৈরি করেছিলো বিস্ময়কর অট্টালিকা, পিরামিড এবং মন্দিরসমূহ। কিন্তু মায়ারা এসব জিনিস তৈরি করেছিলো, তা নাকি তারা নিজেদের প্রয়োজনে করেনি, করেছিলো তাদের হাতের তৈরি পঞ্জিকারই নির্দেশে। মায়াদের তৈরি প্রতিটি পাথরের সাথে কিছু না কিছু সম্পর্ক রয়েছে পঞ্জিকার। এই মায়ারা গ্রহ নক্ষত্র সম্পর্কেও প্রচুর জ্ঞান রাখতো। তারা সৌর জগতের ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহের কথাও জানতো। এসব গ্রহের কথা তাদের পঞ্জিকাতেও আলোচনা করা আছে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো—সৌরজগতের দূরতম এই দু'টি গ্রহ—ইউরেনাস ও নেপচুনের কথা মানুষ জানতে পেরেছে এইতো মাত্র সেদিন। ইউরেনাস ও নেপচুন আবিষ্কৃত হয়েছে যথাক্রমে ১৭৮১ ও ১৮৪৬ সালে। কিন্তু তার কথা মায়ার লোকেরা সেই কয়েক হাজার বছর আগেই জানতে পারলো কেমন করে? নাকি অন্য কেউ তাদের দিয়েছিলো এই জ্ঞান? তাহলে সেই অন্য কেউ—কারা তারা?

প্রাচীন মায়া অঞ্চল পালেংকে পাওয়া গেছে একটি খোদাই করা পাথর। এই পাথরটি আবিষ্কৃত হয়েছে গত ১৯৩৫ সালে। এই পাথরে খোদাই করা চিত্রটি দেখতে অনেকটা নভোচারীদের মতো। যেনো—মনে হয় একটি রকেটে বসে আছে একজন নভোচারী। অংকিত রকেটটির মাথাটা সরু। মাঝে মোটা এবং লেজের দিক থেকে মনে হয় ধোয়া বেরুচ্ছে। আরোহীর পোষাক পরিচ্ছদও অবিকল নভোচারীদের মতোই। কোমরে চওড়া বেল্ট, পরণে খাটো প্যান্ট। কিন্তু মাথায় কোন শিরস্ত্রাণ নেই। এই যা তফাৎ।

প্রাচীন শিল্পীরা এই মহাকাশ যান এবং নভোচারীদের ছবি আঁকলো কেমন করে? সেই যুগেতো রকেট ছিলো না। এমনকি

বিমানও ছিলো না। তাহলে এরকম ছবি আঁকার চিন্তাধারা সে যুগের শিল্পীরা কোথা থেকে পেলেন? নাকি সত্যি তারা দেখেছিলেন নভোযান এবং নভোচারীদের? অনুমান নয়, প্রত্যক্ষ দর্শন করেই তাঁরা এসব ছবি এঁকেছিলেন? ভিন গ্রহের মানুষেরা এসে নেমেছিলো তাদের চোখের সামনেই। তাদের দেখেই তাদের ছবি আঁকার সখ হয়েছিলো সেকালের শিল্পীদের।

॥ ৭ ॥

১৯৬৫ সালের জুন মাসে হাঙ্গেরীয় বংশোদ্ভূত আর্জেন্টিনার প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ হুয়ান মরিস দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়েডর এবং পেরুতে আবিষ্কার করেন এক বিশাল সুড়ংগপথ। হাজার হাজার কিলোমিটার ব্যাপী বিস্তৃত এই রহস্যময় সুড়ংগ পথ।

শুধু সুড়ংগ আবিষ্কারই নয়—তিনি অসীম সাহসে ভর করে এই সুড়ংগে ঢুকে আবিষ্কার করেছেন অনেক রহস্যময় জিনিসও। কে এবং কারা যে এই বিশাল আর রহস্যময় সুড়ংগ পথগুলো তৈরি করেছিলো, কেনো করেছিলো তা সত্যি এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

আবিষ্কারের কয়েক বছর পর্যন্ত ডঃ মরিস খুব গোপন রেখে-ছিলেন কথাটা। তারপর ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে তিনি এই সুড়ংগ পথগুলো দেখাবার জন্য নিয়ে যান আরেক প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ দানিকেন সাহেবকে।

দানিকেন নিজে গিয়ে সব দেখে এসেছেন। সুড়ংগটির অবস্থা ইকোয়েডরের মোরেনশান্তিয়াগো প্রদেশে। অত্যন্ত দুর্গম একটি অঞ্চল। জায়গাটা দেখতে মোটামুটি ত্রিভুজের মতো। গোটা সুড়ংগটাই ঘন অন্ধকারে ঢাকা। ভেতরটা একেবারেই রহস্যময়।

সমকোণী, চৌকা পথ। কোথাও চওড়া, কোথাও সরু। দেয়াল-গুলো আশ্চার্য রকমের পালিশ করা। চেটালো ছাদ। মনে হয় কাঁচ জাতীয় জিনিস দিয়ে ঢাকা ছিলো। সুড়ংগের দেয়াল যেরকম মসৃণ তাতে দেখে মনে হয় না এগুলো কোন সাধারণ কোদাল-গাইতি দিয়ে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। তাহলে কি দিয়ে কাটা হয়েছিলো? সেযুগে তো আধুনিক কোন যন্ত্রপাতিও ছিলো না। তাহলে?

কিন্তু বিস্ময় এখানেই শেষ নয়। সুড়ংগ পথে আলো ফেলে ফেলে সামনে এগিয়ে গিয়েই দানিকেন আর মরিস পেলেন একটি ঘর। অবিকল বিমানবন্দরের হ্যাংগারের মতো। অত ভিতরে গিয়ে দিক হারিয়ে ফেলেছিলেন দানিকেন। তাই পকেট থেকে বের করলেন কম্পাস। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার। কম্পাসের কাটা অনড়। ডঃ মরিস তখন জানালেন যে, এখানে কম্পাসের কাটা নড়বে না। এখানে অবিশ্বাস্যভাবে সারাক্ষণ শক্তিশালী কোনো বিকিরণ ঘটছে। আর তার ফলেই কম্পাসের কাটা এখানে অচল হয়ে যায়।

তারপর আরো এক চমৎকার বিস্ময়ের দেখা পেলেন তাঁরা পরক্ষণেই। একটি প্রকাণ্ড ঘর। গোটাটাই পাথর কেটে তৈরি। ঘরটা ১৫৩ গজ চওড়া, ১৬৪ গজ দীর্ঘ। ঘরের মাঝখানেই রয়েছে সুন্দর করে সাজানো একটি টেবিল এবং সাতটি চেয়ার। অবশ্য অবিকল চেয়ার টেবিলের মতোও নয়। হয়তো জিনিসগুলো অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো— এগুলো কি দিয়ে তৈরি ? ওগুলো হাত দিয়ে স্পর্শ করলে পাথরের মতো ঠাণ্ডা, তেমনি শক্ত। কিন্তু পাথর নয়, কাঠও নয়। এমনকি কোনো ধাতুও নয়। ডঃ দানিকেনের অভিমত—হয়তো ওগুলো কোনো উন্নতমানের প্লাস্টিক। কিন্তু ইস্পাতের মতো কঠিন এবং পাথরের মতো ভারী। কিন্তু প্রশ্ন হলো—সেই আদিকালে এই বিস্ময়কর জিনিস তৈরি করার জ্ঞান তারা কোথায় পেয়েছিলো ? প্লাস্টিক তো আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র কিছু দিন আগে। চেয়ারগুলোর পেছনে খাঁটি সোনার ছাঁচে ঢালা নানা রকম জীবজন্তুর মূর্তি।

ঘরে রয়েছে একটি বিস্ময়কর ধাতব গ্রন্থাগার। অসংখ্য ধাতুর পাতের লিপি। তিন ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা আর এক ফুট সাত ইঞ্চি চওড়া এই পাতগুলো কি ধাতু দিয়ে যে তৈরি তাও বুঝা যাচ্ছে না। মনে হয় ওগুলো কোন শংকর ধাতু। এই ধাতব পাত্রের লিপির পাঠোদ্ধার আজো হয়নি। যদি পাঠোদ্ধার করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই ওই সুড়ংগ তৈরির রহস্য উন্মোচিত হবে। তখন যদি জানা যায় যে—এই সকল বিস্ময়কর জিনিসের স্রষ্টা পৃথিবীর কোনো মানুষ নয়। ভিন গ্রহের অতিথিরা এসেই তাদের উন্নত কারিগরি জ্ঞানের সাহায্যে তৈরি করে গেছে এসব। তাহলে কেমন হবে ?

॥ ৮ ॥

পেরুর শাকশাইহু আমানে এবং ইরাকের কোনো কোনো স্থানে পাওয়া গেছে কাঁচে পরিণত হয়ে যাওয়া শিলা। পাথরকে গলিয়ে তৈরি করতে হয় ওই কাঁচ। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন ভীষণ উত্তাপের। এ ধরণের কাঁচ পাওয়া গেছে চীনের ও আমেরিকার মরু অঞ্চলেও। এগুলো তৈরি হয়েছে পারমাণবিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্ট প্রচণ্ড উত্তাপের ফলে। কিন্তু সেই প্রাচীনকালে পেরুর শাকশাইহু আমানে এবং ইরাকে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটলো যেমন করে? নাকি সুদূর অতীতে এখানে বিস্ফোরিত হয়েছিলো প্রাচীন দেবতাদের রথ?

লেবাননেও পাওয়া গেছে এমন কিছু প্রাচীন কালের পাথর। এগুলোর নাম হলো টেকটাইল। মার্কিন বিজ্ঞানী ডঃ স্টেয়ার পরীক্ষা করে দেখছেন যে এর মূল উপাদান হলো—এ্যালুমোনিয়ামের রেডিও আইসোটোপ। প্রাকৃতিকভাবে এগুলো তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। আধুনিক ল্যাবরেটরীতেও এগুলো তৈরি করা খুব দুরূহ ব্যাপার। তাই যদি হয়, তাহলে আমাদের অশিক্ষিত পূর্ব পুরুষেরা কিভাবে তৈরি করেছিলেন এগুলো?

পেরুর মালভূমিতে পাওয়া গেছে প্ল্যাটিনামের অলংকার। প্লাটিনামের গহনা বানাতে নিশ্চয়ই এগুলোকে গালাতে হয়েছে। কিন্তু প্ল্যাটিনামের মেলটিং পয়েন্ট খুব উঁচু। এক হাজার আট শো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেট উত্তাপের প্রয়োজন হয় প্ল্যাটিনাম গলাতে। কিন্তু আজ থেকে সাত আট হাজার বছর আগের মানুষ এতো উত্তাপ সৃষ্টির কারিগরি জ্ঞান কোথায় পেয়েছিলো?

মিশর এবং ইরাকে পাওয়া গেছে স্ফটিক (Crystal) কাঁটার লেন্স। এই লেন্স তৈরি করা হয় সীজিরাম অক্সাইডের সাহায্যে। আর এই অক্সাইড তৈরি করা হয় তড়িত রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে। অতি প্রাচীনকালের মানুষেরা তা হলে এগুলো তৈরি করার কারিগরি জ্ঞান পেয়েছিলো কোথা থেকে?

॥ ৯ ॥

তাহলে বলতেই হয়, এই যে, উপরে কতকগুলো বিস্মকর জিনিসের উদাহরণ দেয়া হল, এগুলো পৃথিবীর মানুষের তৈরি নয়। অন্তত আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগের অশিক্ষিত মানুষের পক্ষে এমন উন্নত কারিগরি জ্ঞান থাকার কথা নয়। সভ্যতার বিবর্তনের

ইতিহাসও তা বলে না। তাহলে কি এগুলো পৃথিবীর বাইরের কোনো সভ্যতা থেকে আগত প্রাণিদের তৈরি? সত্যি কি তাহলে একদা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন দেবতারা? ভিন্ন গ্রহের সেই উন্নত প্রাণিরা এসে মিশেছিলো পৃথিবীর মানুষের সাথে? পৃথিবীর অশিক্ষিত মানুষকে তারা দিয়েছিলো উন্নত কারিগরি জ্ঞান?

যদি তা হয়েই থাকে। অর্থাৎ সুদূর অতীতে ভিন গ্রহ থেকে মানুষ এসে নেমেছিলো পৃথিবীর মাটিতে, মিশেছিলো তারা মানুষের সাথে। তাহলে নিশ্চয়ই সেকালের মানুষ তাদের ছবি এঁকে রাখার কথা, মূর্তি তৈরি করেও রাখার কথা।

বিস্ময়কর কথা হলো—এ ধরনের অতি প্রাচীন ছবির সন্ধান পাওয়াও গেছে সত্যি সত্যি। প্রাচীন গুহাবাসী মানুষেরা মহাকাশ



উজবেকিস্তানের এক গুহায় আঁকা অতি প্রাচীন পাথর খোদাই ছবি। অবিকল যেনো এক নভোচারীর মূর্তি।

থেকে আগত দেবতাদের ছবি এঁকে রেখেছে গুহার দেয়ালে। এরকম একটি ছবি পাওয়া গেছে উজবেকিস্তানের ভরগনা অঞ্চলের একটি গুহায়। ছবিটি দেখলে সত্যি বিস্মিত হতে হয়। ছবিটির মথায় হেলমেট। পোশাকে আছে বিচিত্র কীসব যন্ত্রপাতির ছবি। হাতে আছে গোলাকার চাকতি। দেখলে অবিকল স্পেসস্যুট পরিহিত নভোচারীদের মতোই মনে হয়। এ ধরনের আরো একটি ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে সাহারার অসিলিতে। এই ছবিটি দেখলেও নভোচারীদের কথা মনে হয়। যিনি ছবিটি আবিষ্কার করেছেন তিনি এর নাম দিয়েছেন 'মার্সিয়ান গডস,।

এবার বলি, একটি মূর্তির কথা। সবচেয় বিখ্যাত মূর্তি হলো জাপানের ডসু মূর্তি। হাজার হাজার বছর ধরে এই ডসুমূর্তিটি পূজো পেয়ে আসছে। কিন্তু মূর্তিগুলোকে দেখলে কনে হয় যেনো স্পেসস্যুট পরিহিত মহাকশ যাত্রী।

তাহলে কি সত্যি সত্যি আমাদের পূর্ব পুরুষরা ভিনগ্রহের মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন ?

পৃথিবীর সভ্য মানুষেরাও তো হন্যে হয় খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের। মহাকাশের শুন্যতায় তারা আজো কান পেতে আছে ভিন গ্রহের মানুষের সাড়া পাওয়ার প্রত্যশায়। যারা এসেছিলো, তারা নিশ্চয়ই আমাদের পৃথিবীর খবর জানে। আর জানে এ গ্রহের সভ্যতার খবরও। হয়তো আজকে আমাদের সভ্যতার উৎকর্ষতা দেখে তারা বিস্মিতও হচ্ছে। কিন্তু সভ্যজগতের মানুষের সাথে কবে তাদের আবার যোগাযোগ হবে ? কবে দেখা হবে মুখোমুখি ?

আগস্ট, ১৯৮৫

চাঁদের মাটিতে মানব বসতি

দূর আকাশের ফুটফুটে যে চাঁদকে হাতছানি দিয়ে ডেকে ডেকে একদা স্নেহময়ী মায়েরা "আয় চাঁদ আয়, চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ-দিয়ে যা "—বলে খোকা-খুকুমণিকে ঘুম পাড়াতেন, সেই চাঁদটাও আজ মানুষের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। সেই চাঁদের বুকেই মানুষ আজ এঁকে দিয়েছে তার পদচিহ্ন।

তবু ঘটনার এখানেই শেষ নয়। দূর আকাশের চাঁদকে নিজের আয়ত্তে এনে আর তার বুকে পদচিহ্ন এঁকে দিয়েই মানুষ ক্ষান্ত হয়নি। এই সুন্দর চাঁদকে নিয়ে মানুষ আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। বিজ্ঞানীরা ভাবছেন—মাহাকাশ গবেষনার জন্য যখন আরো অনেক দূর-দূরান্তে অর্থাৎ গ্রহ থেকে গ্রহান্তরের অজানা পথে যাত্রা করতে হবে, তখন এই চাঁদকে যদি মধ্যবর্তী একটি স্টেশন বানানো যায়, তবে মন্দ হয় না। চেষ্টা করলে নিশ্চই চাঁদের মাটিতে একটি বৈজ্ঞানিক ঘাঁটি স্থাপন করা সম্ভব হবে।

ঘাঁটিটা বানাতে পারলে তো খুবই ভালো হয়। কিন্তু তার জন্য মানুষকে আগে কতোগুলো জটিল সমস্যার সমাধান করতে হবে। প্রধান সমস্যা হলো—ঘাঁটি বানাতে গেলে সেখানে মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করতে হবে।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখছেন, চাঁদের গাছপালা শূন্য আর বায়ুহীন পরিবেশে মানুষকে দীর্ঘদিন বাস করতে হলে তার শরীরে অপুষ্টি দেখা দেবে। এর ফলে মানুষ মারাও যেতে পারে।

এই সমস্যার সমাধান তা হলে কিভাবে হতে পারে? তা হলে কি পৃথিবীর মতো চাঁদের মাটিতেও গাছপালা বা শস্য রোপন করতে হতে পারে? কিন্তু সেখানেতো বাতাস নেই? গাছপালা জন্মাবে কেমন করে? তাহলে কি অন্য কোনো উপায়ে গাছপালা জন্মানো সম্ভব?

এই বিষয় নিয়েই সোভিয়েট ইউনিয়নের কিয়েনস্কি ফিজিকা ইন্‌স্টি-টিউটের বিজ্ঞানীরা অনেকদিন ধরে চিন্তাভাবনা করছেন। ভাবছেন কি করা যায়।

বিজ্ঞানী মিঃ পেনরিখ লিসোভস্কি বলেন,—যেহেতু চাঁদের মাটিতে আবহাওয়ার কোনো অস্তিত্ব নেই, সেহেতু স্বাভাবিক ভাবে চাঁদের মাটিতে কোনো গাছপালা বাঁচতে পারে না।

তাই বলে তিনি একেবারে নিরাশ হয়ে হাত পা গুটিয়ে বসেও থাকেননি। তিনি বলেন,—পরীক্ষা, নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ব্যাপকভাবে না হলেও কৃত্রিম আবহাওয়া সৃষ্টি করে অন্তত খানিকটা জায়গায় চাঁদের মাটিতেও ফসল জাতীয় গাছের চাষ সম্ভব। এতে চারটি চান্দ্রদিবস (এক একটি চান্দ্র দিবস পৃথিবীর পনেরো দিনের সমান) অন্তর অন্তর এই ফসল তোলা যাবে। আরো খুশির খবর এই যে, এতে যে শস্য হবে তা পৃথিবীর মাটির তুলনায় একেবারে কম হবে না।

এই কৃত্রিম আবহাওয়ায় গম জাতীয় ফসলের চাষ করতে হলে প্রথমে কি করতে হবে? বিজ্ঞানীরা বলেন,—এর জন্য একটি মস্ত বড় কাঁচের ঘর বানাতে হবে। কিন্তু শুধু কাঁচের ঘর বানালেই সমস্যার সমাধান হবে না। আরো সমস্যা আছে।

পৃথিবীর একটি দিন আর চাঁদের দেশের একটি দিনতো সমান নয়। পৃথিবীর পনেরো দিনের সমান হলো চাঁদের একদিন। অর্থাৎ চাঁদে যদি সূর্য উঠলোতো পনেরো দিনের আগে আর অস্ত যাবে না। আবার রাত হলোতো পনেরো দিনের আগে আর আলোর মুখ দেখা যাবেনা।

কিন্তু পৃথিবীর কোনো গাছ পালাতো এই অস্বাভাবিক আলো আঁধারে অভ্যস্ত নয়। গাছপালা বেশীদিন অন্ধকারে থাকলে আলোর অভাবে এমনিতেই মারা যাবে। তাহলে শুধু কাঁচের ঘরেইতো হবে না।

কোনো কোনো বিজ্ঞানী তাই বলছেন,—তা হলে এক কাজ করা যায়। অর্থাৎ সেখানে কৃত্রিম আলোর সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে ঘন ঘন দিনরাত্রির সৃষ্টি করা যেতে পারে। তা অবশ্য করা যায়। কিন্তু এই কৃত্রিম আলোর জন্য যে বিপুল পরিমাণের জ্বালানি দরকার

হবে-তা যে খুবই ব্যয় বহুল। সুতরাং এপথে এগোনা যাবেনা। অন্য পথের সন্ধান করতে হবে।



চাঁদের মাটিতে তৈরি প্রস্তাবিত কাঁচের ঘরে গম চাষের নমুনা।

এই অন্য পথের কথাও বিজ্ঞানীরা চিন্তা করছেন। বরং এটাই হবে সহজ। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, পৃথিবীর গাছ পালার এই যে দিনরাত্রীর আলো আঁধারের ছন্দোবদ্ধ জীবন, এটি নিতান্তই একটি অভ্যাসের ব্যাপার। ইচ্ছে করলেই অভ্যাস বদলানো যায়। অর্থাৎ ধীরে ধীরে প্রজনন ঘটিয়ে পৃথিবীর মাটিতে এমন কিছু ধরনের গম জাতীয় গাছের সৃষ্টি করা যায়, যেগুলো দিন পনেরো সময় কাল অন্ধকারে থাকলেও মরে যাবে না। তাহলে সেই প্রজাতির গমগুলোকেই চাঁদের মাটিতে বপন করা যাবে।

এখন তাই বিজ্ঞানীরা পরীক্ষায় লেগেছেন সম্ভাব্য যে পরিবেশে গমের বীজগুলোকে চাঁদের মাটিতে বপন করা হবে এবং তারা ফলন দেবে সেই পরিবেশে কি করে তাদের অভ্যস্ত করে তোলা যায়? এই জন্যই গমের চারাগুলোকে প্রচুর প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাদের অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

কথাটা আজগুবি বলে মনে হলেও একেবারে সত্যি। বিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষা চালাতে গিয়ে দেখেছেন যে দীর্ঘ অন্ধকারে গাছ মরে গেলেও একটি গভীর এবং শান্ত পরিবেশে গাছপালা দীর্ঘ সময়ের জন্য অন্ধকার সহ্য করতে পারে। তাই চাঁদের পরিবেশে পৃথিবীতে কিভাবে গম ও অন্যান্য বার্ষিক উদ্ভিদকে বাঁচাতে শেখানো হচ্ছে তা দেখা যাক।

এই প্রশিক্ষণের জন্য উদ্ভিদ গুলোকে ট্রেনিং সেন্টারে পাঠানো হচ্ছে। এখানে একটি বিশেষভাবে তৈরি ঘরে ধারাবাহিক কৃত্রিম আলোর পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা সৃষ্টি করা হয়েছে, অবিকল চান্দ্র দিবসের আলোর অনুরূপ করে।

এখন এই কৃত্রিম ধারাবাহিক আলোর পরিবেশেই পৃথিবীর অনুরূপ পনেরো দিনে গম বা শাক শবজির গাছ বেড়ে উঠলে আবার এই সময়ের জন্য এসব গাছপালাকে অন্ধকারে রাখা হয়।

কিন্তু এখানেও একটি অসুবিধা দেখা দেয়। কক্ষের তাপমাত্রায় গাছপালাগুলো ক্লোরোফিল শূন্য হয়ে পড়ে এবং পাতাগুলো তাদের সত্যিকার রঙ হারিয়ে ফেলে। পরে আস্তে আস্তে মরে যায়।

কিন্তু এই অসুবিধাটাও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, অনুকরণীয় চাঁদের রাতের সাথে হ্রাসকৃত তাপ মাত্রার সমন্বয় সাধন করা যায়। গাছপালাগুলো খনিজ সম্পদ

বিশেষকরে নাইট্রিক পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। এবং বাষ্পীয় ভবনের কারণে সৃষ্ট আর্দ্রতায় ক্ষতি সাধিত হয়। কিন্তু সে ক্ষতিসমূহকে পূরণ করার জন্য কেবল জল সরবরাহ করা হলেই তারা কৃত্রিম চাঁদের রাত ভালভাবে সহ্য করতে পারে।

এই গমের চারাগুলোকে চান্দ্র দিবসের দিন রাত্রির পরিবেশ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

এ ছাড়া গাছগুলোকে রাখা হয়েছে তিন থেকে চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার অন্ধকারে। একটি চান্দ্র রাতে গমের চারাগুলো বাড়তে থাকে। দ্বিতীয় চান্দ্র দিবসের সময়ে এসব গাছের মঞ্জরী ধরে এবং পড়ে এগুলোকে আবার অন্ধকারে রাখা হয়। দিনরাতের এই পরিবর্তনের ছন্দে গাছপালাগুলো স্বাভাবিক ভাবে বিকাশ লাভ করে, মঞ্জরী ধরে এবং ফসল দেয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষের এই গাছপালার বিশেষ ধরনের কলমই চান্দ্র অঞ্চলে লাগানো হচ্ছে। সেখানে এগুলোর প্রশিক্ষণ বিষয়ে পরীক্ষা করা হয়।

এ ভাবে ফসল ফলাতে সঠিক পরিপক্কতার অভাবে ফসলের সামান্য তারতম্য হয় বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন। কিন্তু এই ফলন কম হওয়াটা এখানে বড় কথা নয়।, গাছগুলো যে এই কৃত্তিম পরিবেশে ও স্বাভাবিকভাবে বায়োকেমিক্যাল মিশ্রণে শিকড় দেয় এটাই হলো আসল সাফল্য।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, চাঁদের মাটিতে এভাবে ফসল ফলাতে সাভাবিক সূর্যের আলোও হয়তো জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি সত্যি এটা করা যায়, তবে কৃত্রিম আলোর জন্য যে বিপুল পরিমাণে জ্বালানি খরচ হবে, তার কিছুটা সাশ্রয় হবে। যেখানে চাঁদে মানুষ ঘাটি গাড়বেন, সে এলাকায় জ্বালানি সরবরাহের সমস্যাও বিপুলভাবে কমে যাবে।

এখানে বলা দরকার যে, চাঁদের রাতকে অনুকরণ করার জন্য পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা নিয়ন্ত্রিত আলো, তাপমাত্রা, গ্যাস ব্যবস্থা ও খনিজ পুষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করে এক বিশেষ ফ্রিজিং চেম্বারে একটি চান্দ্র দিবস সৃষ্টি করেছেন। কেবলমাত্র চান্দ্র অভিবর্ষ (এটা পৃথিবীর চেয়েও কম) অনুকরণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, গাছপালার স্বাভাবিক বেড়ে উঠার জন্যে অল্প স্বল্প অভিকর্ষই যথেষ্ট। এটা প্রমাণ করে দেখা গেছে যে, সব গাছপালাই চান্দ্র দিবস সহ্য করতে পারে না। তাপ প্রিয় গাছ যেমন—টমেটো, শসা ইত্যাদি উচ্চ তাপ মাত্রায় ক্লান্তিতে এবং নিম্নতাপ মাত্রায় ঠাণ্ডায় মরে যায়। তাই এখন ভেবে দেখা হচ্ছে ভবিষ্যতে চাঁদের ঘাঁটিতে কোন্ কোন্ ধরনের গাছপালা মানুষকে অক্সিজেন ও খাদ্যের যোগান দেবে?

এই গাছ বাছাই করতে গিয়ে দেখা গেছে যে সূর্যের আলো সরাসরিভাবে ব্যবহার করা না গেলেও এটা কেবলমাত্র তরলিত আকারে ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে কিছু কিছু গম জাতীয় গাছ বাঁচাতে পারে। প্রস্তাবিত চান্দ্র ঘাঁটিতে মনুষ্য বসতির জন্য প্রয়োজন হবে প্রতি বর্গ মিটারে একশত থেকে দুশো ওয়াট আলোর বিচ্ছুরণ প্রচণ্ডতা। কিন্তু চাঁদের দেশে এই আলোক বিচ্ছুরণের প্রচণ্ডতার পরিমাণ হলো প্রায় ছয়শো ওয়াট।

তাহলে এই মাত্রাতিরিক্ত আলোক বিচ্ছুরণ কমানোর জন্য প্রয়োজন হবে ফিল্টার স্থাপন করার। কেনো না চাঁদে কোন বায়ু-মণ্ডল নেই।

এই বায়ুমণ্ডলই সূর্যের আলো থেকে অবলোহিত, অতিবেগুনী রশ্মির এক উল্লেখযোগ্য অংশ শুষে নেয়। বায়ুমণ্ডলই সূর্যের তাপের প্রখরতা ও ক্ষতিকর পদার্থ পৃথিবীতে আসতে দেয় না।

প্রশ্ন হলো—চাঁদের মাটি কি চাষাবাদের কাজে ব্যবহার করা যাবে? বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, গাছ-পালার পক্ষে চাঁদের মাটি বিষবৎ না হলেও গাছপালার জন্য যে যে ধরনের প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর পদার্থের দরকার, তা এখানে নেই। তবে চাঁদের মাটিতে হাইড্রোথিকো অথবা হাইডাইটের ব্যবহার করা যেতে পারে। এর পর আরো প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান বিশেষ করে নাইট্রিক ও ফসফরাস মিশ্রিত পদার্থসমূহ—পৃথিবী থেকে নিয়ে যেতে হবে সেখানে।

সেখানে খুব বেশী লবণের দরকার পড়বে না। কারণ গাছ পালার বায়োমাপের এসবের অংশ পাঁচ থেকে সাত ভাগ। কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং মানুষের তৈরি পানি ব্যবহার করে ফটোসিন্থেসিসের

কল্যাণে গাছপালা জৈব পদার্থ তৈরি করবে এবং মানুষকে সরবরাহ করবে অক্সিজেন, বিশুদ্ধ পানি এবং খাদ্য।

॥ ২ ॥

এদিকে মার্কিন বিজ্ঞানীরাও চাঁদের মাটিতে মানব বসতি গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করেছন। চলছে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা।

নাসা (Nasa)-র ডেপুটি এডমিনিস্টেটর মিঃ হ্যান্স মার্ক (Hans Mark) বলেছেন,—হয়তো আগামী দু'হাজার সাল নাগাদ পৃথিবীর মানুষ চাঁদের মাটিতে বসবাস করতে সক্ষম হবে।

এর জন্য প্রস্তুতি অবশ্য ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। চাঁদের মাটিতে পৃথিবীর মানুষকে বাস করতে হলে কি কি ধরনের অসুবিধার মোকাবিলা করতে হবে, এর জন্য কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে, কি ধরনের বাসস্থান তৈরি করতে হবে, তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। চাঁদের বুকে মানুষের সম্ভাব্য বাসস্থানের একটি মডেলও বিজ্ঞানীরা ইতি মধ্যেই তৈরি করে ফেলেছেন। সেখানে লোকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

চাঁদের বুকে মানুষের বসবাসের সবচেয়ে বড় অসুবিধা সৃষ্টি করবে অক্সিজেনের অভাব। চাঁদে তো বাতাস নেই। তাই সেখানে অক্সিজেনও নেই। কিন্তু পৃথিবীর মানুষের পক্ষে তো অক্সিজেন ছাড়া মুহূর্ত কালও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

তাই মানুষ যাওয়ার পূর্বেই সেখানে আগেই অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্য এ নিয়েও বিজ্ঞানীরা চিন্তা ভাবনা করেছেন তার ব্যবস্থাও হচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রথম অবস্থাতেই মানুষ অবশ্য চাঁদের বুকে গিয়ে দিব্যি ঘর সংসার পেতে বসতে পারবে না। প্রথমে পাঠানো হবে মাত্র জন কয়েক লোককে। তারাও অবশ্য সাধারণ মানুষ হবে না। বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শুধু মহাকাশচারীরাই যাবেন চাঁদে। তাঁরা সেখানে বসেই দূর মহাকাশে চালাবেন নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা।

তাঁদের জন্য চাঁদে এমন ধরনের ঘর তৈরি করা হবে যাতে মহাকাশের মহাজাগতিক রশ্মি তাঁদের কোনো ক্ষতি না করতে পারে। তার পরেও প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ এক নাগাড়ে খুব বেশীদিন চাঁদের বুকে থাকতে পারবে না। বড় জোড় দুতিন মাস, কিংবা তার সামান্য কিছু বেশী হতে পারে।

আগেই বললাম—চাঁদে বাস করতে হলে মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজন হবে অক্সিজেনের। কিন্তু সেই অক্সিজেন পাওয়া যাবে কোথাে থকে? পৃথিবী থেকেতো এতো অক্সিজেন বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই চাঁদের বুকে থেকেই এই অক্সিজেন জোগার করতে হবে।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন চাঁদের বুকের কোনো কোনো স্থানের মাটির মধ্যে ৪০ ভাগ অক্সিজেন মিশে আছে বিজ্ঞানীরা বিশেষ ধরণের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে এই মাটি থেকেই অক্সিজেন সংগ্রহ করতে পারবেন। তারপর সেই অক্সিজেনকে তরল করা হবে। সেই তরল অক্সিজেনকে বিশেষ ধরনের ট্যাঙ্কে ভর্তি করা হবে।

চাঁদের মাটিতে প্রাথমিক অবস্থায় যে বাসস্থান তৈরি করা হবে সেটি হবে একটি অক্সিজেন শোধনাগার বিশেষ। এই শোধনাগারে বসেই বিজ্ঞানীরা চালাবেন মহাকাশ গবেষণা। তারা মহাকাশের দূর পাল্লায় যে সব রকেট পাঠাবেন এই চাঁদের বুকের শোধনাগার থেকেই সেগুলো তরল অক্সিজেনের জ্বালানি গ্রহণ করবে। এতে মহাকাশ গবেষণায় জ্বালানি সংকটেরও অনেকখানি মোচন হবে।

যুক্তরাষ্ট্র ইতি মধেই মহাকাশে একটি মহাকাশযান স্থাপনও করেছেন। এটি হবে একটি মধ্যস্থতাকারী মহাকাশ স্টেশন।

বর্তমানে যুক্তরাষ্টের যে মহাকাশ খেয়াতরী 'ডিস্কভারী' রয়েছে। প্রথমটি অবশ্য ধ্বংস হয়ে গেছে এবং নতুন করে তৈরি হচ্ছে এই খেয়াযান। এটার দ্বারাই পৃথিবী থেকে মানুষ কিংবা অন্যসব প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বয়ে নিয়ে প্রথমে এই মহাকাশ স্টেশন তোলা হবে। পরে অপর একটি বিশেষ যানে করে নামানো হবে চাঁদের বুকে।

আবার চাঁদের বুকের ল্যাবরেটরী থেকেও প্রথমে তরল অক্সিজেন জ্বালানি টেনে তোলা হবে এই মহাকাশ স্টেশনে। তারপর এই মহাকাশ স্টেশন থেকেই দূর মহাকাশ যাত্রার রকেটগুলো জ্বালানি গ্রহণ করবে।

চাঁদের মাটিতে বসবাসের আর একটি বড় অসুবিধা হলো জলের অভাব। জল ছাড়াতো কোনো প্রাণী বাঁচতে পারে না। তাই মানুষকে সেখানে থাকতে হলে পৃথিবীর বুক থেকে প্রয়োজনীয় জল নিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু দৈনিককার ব্যবহারের হাজার হাজার টন জলতো পৃথিবীর বুক থেকে টেনে নেয়া সম্ভব হবে না। তাহলে এতো জল পাওয়া যাবে কোথা থেকে ?

বিজ্ঞানীরা সে ব্যবস্থাও করেছেন। আমরা জানি—দুভাগ হাইড্রোজেন এবং একভাগ অক্সিজেন মিলে (H_2O) মিলে তৈরি হয় জল। এই দুটি গ্যাস চাঁদের মাটি থেকে সংগ্রহ করা যাবে। আর তা থেকেই তৈরি করা যাবে জল।

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালিফোর্নিয়া মহাকাশ গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক মি: জেমস আর আরনল্ড বলেছেন,—চাঁদের এক পিঠ তো সর্বক্ষণ ঘন ছায়ার অন্ধকারে ঢাকা থাকে। সেই অন্ধকার অংশে এবং চাঁদের দু'ই মেরু প্রান্তে হয়তো কঠিন বরফের আকারে জল লুকিয়েও থাকতে পারে। যদি তা থাকে, তবে সমস্যার সমাধান হবে অনেক সহজেই। সেই কঠিন বরফকে গলিয়েই তৈরি করা যাবে তরল জল।

তা চাঁদের বরফ গলানো জলই হোক, আর গ্যাস থেকে তৈরি জলই হোক, জল তৈরি করা যাবেই। আর যদি জল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তাহলে আরো সুবিধা হবে। চাঁদের বুকে যে বড় বড় গর্ত আছে—তার দু'একটাকে জলে পরিপূর্ণ করা যাবে। আর তা যদি যায়, তখন চাঁদের বুকে বিশেষ ব্যবস্থায় গাছপালাও উৎপাদন করা যেতে পারে। কে জানে এমনি করে হয়তো চাঁদও একদিন পৃথিবীর মতোই প্রাণীদের কলকোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠবে।

তবে এই প্রচুর জল পাওয়া, জল দিয়ে চাঁদের বুকে হ্রদ সৃষ্টি করা—এসব হলো সুদূর ভবিষ্যতের কল্পনা। অনেকটা প্রায় অসম্ভব চিন্তাও।

কিন্তু অমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার আগেই চাঁদের বুকে মানুষের পদচারণা শুরু হবে বিশেষ প্রক্রিয়ায়—বিশেষ প্রয়োজনে।

চাঁদের বুকে আছে নানা ধরনের খনিজ পদার্থ। সেই খনিজ পদার্থকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হবে। এই খনিজ পদার্থ থেকেই তৈরি হবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অনেক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। সেন্ট লুইস (St Louis) এর ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের (Washinton University) খনিজ পদার্থ অনুসন্ধান বিশেষজ্ঞ মিঃ ল্যারী হাসকিন (Larry Haskin) এবং মিঃ ডেভিড লিণ্ডস্টর্ম (Dravid Lindstrom) বলেছেন,—চাঁদের মাটিতেই অনেক মূল্যবান খনিজ পদার্থ পাওয়া যাবে। যেমন—চাঁদের মাটি থেকে লোহা (Iron), টিটানিয়াম (Titanium), সিলিকন (Silicon) প্রভৃতি মূল্যবান খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

এই খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করার জন্য চাঁদের বুকে দু'টি ছাদ ঘেরা সৌরশক্তি পরিচালিত কারখানাও স্থাপন করা হবে। এর আকার হবে প্রায় একটি ফুটবল খেলার মাঠের সমান। এই কারখানায় প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় এক টন করে লোহা উৎপাদন করা হবে।

বিজ্ঞানী হাসকিন বলেছেন,—চাঁদের বুক থেকে পাওয়া সিলিকন থেকে তৈরি করা হবে সোলার সেল (Solar Cell). এই সোলার সেলের সাহায্যে তৈরি করা যাবে অধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুতের সাহায্যে তৈরি করা যাবে আরো বেশী পরিমাণে লোহা। এই লোহার দ্বারা সংগ্রহ করা যাবে আরো বেশী সিলিকন।

টিটানিয়ামের সাথে লোহার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তৈরি করা যাবে স্টীল। এই স্টীল থেকে চাঁদের বুকে তৈরি করা যাবে নানা ধরনের গৃহ-সরঞ্জাম, নানা রকম যন্ত্রপাতি। এই স্টীল দিয়ে চাঁদের বুকেই তৈরি হবে মহাকাশযান। তখন এই চাঁদের বুক থেকেই মহাকাশযানগুলোকে মহাশূন্যে পাঠানো হবে।

পৃথিবীর মাটি থেকে একটি রকেট মহাশূন্যে পাঠাতে যে বেগ পেতে হয়, আর যে বিপুল পরিমাণ জ্বালানির দরকার হয়, চাঁদের মাটি থেকে পাঠাতে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগও খরচ হবে না।

পৃথিবীর মাটি থেকে উপরে উঠতে সবচেয়ে বড় বাধা হলো তার ঘনবায়ুস্তর ভেদ করা এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাটিয়ে উঠা।

একটি রকেটকে মাটি থেকে তিনচার শো কিলোমিটার পথ উপরের দিকে উঠতেই তার অর্ধেক জ্বালানি শেষ হয়ে যায়। কিন্তু চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনেক কম, আর বায়ুস্তর নেই। সেখানে একটি রকেট উপরে উঠতে কোনো কিছুতেই বাধাপ্রাপ্ত হবে না।

ফলে পৃথিবীর বুক থেকে রকেট পাঠাতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হয় তার অনেক সাশ্রয় হবে।

তবে নাসার বিজ্ঞানীরা বলেন,—পৃথিবীর বুক থেকে চাঁদের মাটিতে মহাকাশ গবেষণাগার স্থানান্তরিত করলে আর্থিক দিকের একটা সুবিধা হবে তা ঠিকই। কিন্তু আর্থিক দিকটাই বড় কথা নয়। ওটাই শুধু মূল উদ্দেশ্য নয়। এর চেয়েও বড় লাভ হবে অন্য দিকে।

বিজ্ঞানীরা বলেন,—মহাকাশ গবেষণায় মানুষ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে একথা সত্যি। কিন্তু এখনো মানুষ তার প্রাথমিক অবস্থাটাই কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মানুষ ভবিষ্যতে আরো হাজারগুণ উন্নতি করবে। মহাকাশের অনেক অজানা রহস্য ভেদ করবে মানুষ। সেদিনতো সামনে।

বিজ্ঞানীরা বলেন,—চাঁদের মাটিতে যদি মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে, তা হলে একটি বিরাট রহস্য উন্মোচন করা যাবে।

এই মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় রহস্য হলো প্রাণের সঞ্চার। পৃথিবীতে যে পরিবেশে প্রাণের সঞ্চার হয়েছিলো চাঁদের বুকে বসে মানুষ সে সম্পর্কে গবেষণা করতে পারবে।

জানতে পারা যাবে কবে এই সৌর-জগতের সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি গোটা মহাবিশ্বের জন্ম রহস্যটাও উন্মোচিত হবে।

চাঁদের বুকে মানুষের বসতি স্থাপনের মাধ্যমেই হবে বহির্বিশ্বে পৃথিবীর মনুষের প্রথম পদচারণা। এমনি করেই হয়তো পৃথিবীর মানুষ একদিন ছড়িয়ে পড়বে গোটা বিশ্বে।

জুন, ১৯৮০

চলমান মানচিত্র

॥ ১ ॥

কথায় বলে—'মাটির মতো স্থির'। পৃথিবীর সব জিনিসই কমবেশী নড়াচড়া করে। এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যায়। কিন্তু মাটি কখনো নড়ে না। তাই মাটিকে বলা হয় নিশ্চল পদার্থ।

কিন্তু সম্প্রতি বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে সেই চিরদিনের প্রবাদ বাক্যটিও এখন নড়ে চড়ে উঠতে শুরু করেছে। অর্থাৎ এই অচল মাটিও নাকি সত্যি সত্যি আর অচল নয়। চলমান বিশ্বের আর হাজারটা পদার্থের মতো নাকি এই মাটিও চলে বেড়ায়।

মহাকাশের ওই যে গ্রহ-নক্ষত্র, এরা যেমন অবিরাম নিজের কক্ষপথে ছুটে বেড়াচ্ছে, পৃথিবীও ঘুরছে তেমনি তার নিজের কক্ষপথে। এমনকি ঘুরছে সে তার নিজের বিন্দুতেও। এই চলমান বিশ্বের সাথে তাল রেখেই পৃথিবীর উপরকার প্রতিটি বস্তুই ছুটে চলছে তার নিজের নিজের পথে।

এই যে পৃথিবীর বিশাল পৃষ্ঠদেশ। এই পৃষ্ঠদেশের অনন্ত বিস্তৃত জলরাশি, তার উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল ভূ-খণ্ড। দেশ, মহাদেশ, দ্বীপ, পাহাড় পর্বত। এরাও নাকি ছুটে চলেছে নিজের পথে।

ভূ-তত্ত্ববিদ্‌দের এই সাম্প্রতিকতম আবিষ্কারটি বিশ্ববাসীকে কম বিস্মিত করেনি। আর এই নিয়ে তাঁরা যতোই গবেষণা করছেন, পৃথিবীও ততই তাঁদের কাছে রহস্যময় হয়ে ধরা পড়ছে। তাঁদের বিস্ময় শুধু বাড়ছেই দিনে দিনে।

ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে ভূ-পৃষ্ঠের মানচিত্রে আজকের দেশ ও মহাদেশগুলো যেখানে যেভাবে অবস্থান করছে, এমনি অবস্থা নাকি চিরকাল ছিলো না। অর্থাৎ মানচিত্রে আমেরিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া বা এ্যান্টার্কটিকা মহাদেশগুলো এখন যেখানে রয়েছে, হয়তো কোটি কোটি বছর আগে এমনভাবে ছিলো না এবং

আরো কয়েক কোটি বছর পরে আজকের মানচিত্রের এই চেহারাটাও বদলে যাবে। অন্য কোনো রকম অবস্থান থেকে এই ভূ-খণ্ডগুলো বর্তমান অবস্থায় এসেছে, আবারও এর পরিবর্তন ঘটবে। হবে অন্যরকম।

অবশ্য মানচিত্রের এই যে পরিবর্তন, এটা খুব দ্রুত ঘটে না। রাতারাতিও কিছু একটা হয়ে যায় না। হয় খুবই ধীরে ধীরে, সবার অলক্ষ্যে এবং লাখো বছর ধরে অতি সন্তর্পণে ঘটে এই পরিবর্তন। তাই সহজে কারো চোখেই পড়ে না।

মহাসাগরের উপর জেগে থাকা এই মহাদেশ নামের বিশাল বিশাল ভূ-খণ্ডগুলো যে হেঁটে বেড়ায়, তা এদের আকৃতি দেখলেও অনুমান করা যায়। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বলেও মনে হয়।

॥ ২ ॥

এই যেমন—মানচিত্রটা একবার খুলে দেখা যাক। বের করি আটলান্টিক মহসাগরের দিকটা। এর পূব পার্শ্বে রয়েছে আফ্রিকা মহাদেশ। আর পশ্চিম পাশে রয়েছে দুটো মহাদেশ— দক্ষিণ আমেরিকা এবং উত্তর আমেরিকা। এ দুটো মহাদেশকে যোগ করেছে পানামা যোজক। দুটো মহাদেশের সংযোগকারী এই অঞ্চলটা কেমন সরু। এখানে সাগর অনেকখানি ভেতরে ঢুকে গেছে। তেমনি দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব-উত্তর প্রান্তটা কেমন কুঁজো হয়ে গেছে।

আর এদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আফ্রিকা মহাদেশটা। এর পশ্চিম-উত্তর দিকটা আবার কেমন যেনো ঠেলে খানিকটা বেড়ে গেছে। এখন যদি আফ্রিকা মহাদেশের এই কুঁজো অংশটা ঠেলে নিয়ে পশ্চিম দিকের দুই আমেরিকার মাঝখানের খাঁচে ফেলা যায়, তবে মনে হয় খাপে খাপে মিলে যাবে। তেমনি দক্ষিণ আমেরিকার বাড়ানো অংশটাও মিশে যাবে আফ্রিকার খাঁচে। এখন অবশ্য কথাটাকে অনেকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু তা দিলেও ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন—এই অবস্থায় নাকি এরা একদিন সত্যি সত্যি ছিলো।

আফ্রিকা মহাদেশ লাগোয়া ছিলো আমেরিকা মহাদেশের সাথে। সেদিন এই বিশাল আটলান্টিক মহাসাগরের অস্তিত্ব ছিলো না। কোটি

কোটি বছর আগে এই ভূ-খণ্ডগুলো সব একত্রে ছিলো। তারপর এক সময় ফাঁক ধরলো। কোটি কোটি বছরে সেই ফাঁক আরো



পৃথিবীর ভূ-খণ্ডগুলোর বর্তমান অবস্থান।

বড় হতে লাগলো। দু'টি মহাদেশ সরে যেতে থাকলো পরস্পর থেকে দূরে। আর তাদের ফাঁকের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হলো আজকের এই বিশাল আটলান্টিক মহাসাগর।

ভূ-বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরেই পৃথিবীর এই নানা রকম গঠন-বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন। কেমন করে পৃথিবীর এই বিশাল জলরাশির জন্ম হলো? কেমন করে সৃষ্টি হলো দ্বীপ, দ্বীপান্তর, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বতের।

এর মধ্যেই কোনা কোনো ব্যাপার বিজ্ঞানীদের আরো ভাবিয়ে তুলেছে। এমনও দেখা গেছে, ওই যে আকাশ-ছোঁয়া পর্বত। ওই হাজার হাজার ফুট উঁচু পর্বতের চূড়ার উপরে পাওয়া গেলো কোনো প্রাণীর ফসিল। কিন্তু এটা কেমন করে হলো? অত উঁচুতে ওই প্রাণীটার তো কখনো বসবাস করার কথা নয়। তাহলে সেখানে প্রাণীটার ফসিল গেলো কেমন করে? অন্য কোনো প্রাণীর পক্ষেও সেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে মূল রহস্যটা কি?

আর এই মূল রহস্যের সমাধান করতে গিয়েই বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন এই মহাদেশগুলোর হেঁটে বেড়ানোর কথা যা

এদের গতিশীলতার কথা। তারা দেখেছেন, এই সব আজগুবি ব্যাপারেরও মূল নায়ক হলো ওই অচল মাটির সচল হওয়ার ঘটনা।

বিজ্ঞানীরা এখন নিশ্চিত যে, এই পৃথিবীর কোনো ভূ-খণ্ডই স্থির নয়। এরা সবাই চলমান। গতিশীল। অবশ্য এদের এই গতিশীলতার সাথে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গতিশীলতার অনেক পার্থক্য আছে। গ্রহ-নক্ষত্রের গতিশীলতার মধ্যে রয়েছে একটি সুন্দর শৃংখলাবোধ। ওরা প্রতিটি দিনক্ষণ মিনিট পর্যন্ত হিসেব করে চলে, আর এদের গতিপথও নির্দিষ্ট। কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠের এই ভূ-খণ্ড-গুলোর গতিপথ যেমন সুশৃংখল নয়, তেমনি এদের এই চলাচলেরও কোনো বাঁধা-ধরা সময়কাল নেই।

এই ভূ-খণ্ডগুলো একান্তই অন্ধের মতো এলোমেলো গতিতে ছুটে বেড়ায়। আর ঘুরতে ঘুরতেই এরা একটির ওপর আরেকটি পড়ে এসে হুমড়ি খেয়ে। একটির সাথে অন্যটির লাগে প্রচণ্ড ধাক্কা। আর তার ফলেই ভূ-খণ্ডের ভূ-ত্বকের হয় পরিবর্তন। কোথাও একটি বড় ভূ-খণ্ডের প্রচণ্ড চাপে অন্যটি দেবে যায় নীচের দিকে। সৃষ্টি হয় সাগরের। আবার কখনো বা দুটি বিশাল ভূ-খণ্ডের পারস্পরিক চাপের ফলে কোথাও ফুলে উঠে ভাঁজ খেয়ে। সৃষ্টি হয় পাহাড় পর্বতের। পৃথিবীর প্রায় সবগুলো পর্বতমালার সৃষ্টি প্রায় এভাবেই হয়েছে।

এই যে ভূ-খণ্ডগুলো এলোমেলো গতিতে ছুটে বেড়াচ্ছে, এদের গতিবেগ কিন্তু নেহাৎ কম নয়। আর এজন্যই ভূ-বিজ্ঞানীরা এদের চলার গতিকে উশৃংখলগতি বা Wild Speed বলে অভিহিত করেছেন।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, এই ভূ-খণ্ডগুলো প্রতি বছর কম পক্ষে দেড় থেকে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে। ভূ-খণ্ড তথা একটি আস্ত বিশাল মহাদেশের পক্ষে বছরে পাঁচ ছয় ইঞ্চি সরে যাওয়া বিস্ময়কর তো বটেই!

আর এমনি গতিতে সরে গিয়েই একটা ভূ-খণ্ড আরেকটা মহাদেশের গায়ের উপর পড়ে হুমড়ি খেয়ে। তারপর ঘটায় সব লংকাকাণ্ড।

॥ ৩ ॥

এখানে একটা ব্যাপার নিয়ে হয়তো অনেকের মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। মহাদেশগুলো যে চলে বেড়ায় তা না হয় হলো। কিন্তু এরা চলে কেমন করে? এদের কি হাত-পা আছে? নাকি কেউ ঠেলে নিয়ে যায় এদের? এরা তাহলে কিসের উপর নির্ভর করে চলে?

অবশ্য ভূ-তত্ত্ববিদ্গণ এর উত্তরও আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা বলেন,—এই ভূ-খণ্ডগুলোর সরে যাবার মূল কারণ হলো ভূমিকম্পের ফলে যে কম্পনের সৃষ্টি হয় সেই কম্পনই ধীরে ধীরে ধাক্কা মেরে মেরে এগুলোকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ভূ-পৃষ্ঠে তো সর্বক্ষণ ভূমিকম্প হচ্ছেই।

অবশ্য শুধু ভূকম্পনই নয়। এছাড়া অন্য কিছু কিছু শক্তিও আছে। আর আছে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্ট প্রচণ্ড কম্পনশক্তি। আছে সাগরের প্রবল স্রোত।

এই সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিই এই বিশাল ভূ-খণ্ডগুলোকে ঠেলতে থাকে দিনের পর দিন ধরে। ঠেলে নিয়ে যায় পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। লাখো লাখো বছর ধরে চলে এই কর্মকাণ্ড।

এখানে আরো একটি ব্যাপার জানা দরকার। শুধু সাগরের উপর ভাসমান পাহাড়, পর্বত, নদী, অরণ্যশোভিত, মুখরিত দেশ-মহাশেগুলোই যে চলে বেড়ায় তা নয়, ওই বিশাল সাগর মহাসাগরের জলের নীচেও রয়েছে আরো অনেক ডোবা আধাডোবা ভূ-খণ্ড। এরাও ওই ডাঙ্গাগুলোর মতই চলমান। তবে তাদের কর্মকাণ্ড যা কিছু ঘটবার তা অতল সাগরের তলদেশেই ঘটে। লোকচক্ষে ধরা পড়ে না।

কিন্তু কখনো কখনো এই ডুবন্ত ভূ-খণ্ডের সাথে ডাঙ্গা ভূ-খণ্ডের সংঘর্ষ বাধে। তখন হয় মজার ব্যাপার। হয়তো একটি মহাদেশ তার পৃষ্ঠদেশের পাহাড-পর্বত, অরণ্য নিয়ে এসে চড়ে বসে অন্য একটি ডুবন্ত বিশাল ভূ-খণ্ডের উপর। জেগে থাকা মহাদেশটি ঘাড়ের উপর চড়ে বসে তার। তারপর ডাঙ্গা মহাদেশ তার গায়ের প্রচণ্ড

শক্তি দিয়ে ডুবন্ত ভূ-খণ্ডটিকে দলে মুচড়ে দিয়ে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। ডুবন্ত মহাদেশ তখন দেবে যায় আরো নীচের দিকে।

এই সময় ঘটে এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড। একটি ডুবন্ত ভূ-খণ্ড আর একটি ডাঙ্গা ভূ-খণ্ডের সংঘর্ষে সাগরের তলদেশে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড উত্তাপের। তাপমাত্রা প্রায় ২০০ ফাঃ পর্যন্ত পৌঁছায়। এই প্রচণ্ড তাপমাত্রায় সমস্ত কিছু গলে একাকার হয়ে যায় এবং এই গলিত পদার্থ জমতে থাকে সাগরের তলদেশে।

এর সাথে রয়েছে সাগরের তলদেশের আগ্নেয়গিরিসমূহ। সাগরের নীচের আগ্নেয়গিরি থেকেও বের হতে থাকে উত্তপ্ত লাভা। এই গলিত লাভাও জমতে থাকে সাগরের তলায়। আর এমনি করেই তলানী জমতে জমতে সৃষ্টি হয় এক একটি নতুন ভূ-খণ্ডের। একটি নতুন দ্বীপের।

ক্যারিবিয়ান সাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলো—যেগুলো পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিত—এই দ্বীপগুলোর জন্মের ইতিহাসও নাকি এমনিই। দক্ষিণ আমেরিকা নামের ওই বিশাল ভূ-খণ্ডটির উত্তর পশ্চিম দিকে সরে যাবার সময় যে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয়েছিলো তার ফলেই জন্ম নিয়েছিলো এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ডগুলোর। এদিকে রয়েছে ফিলিপাইন, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। এ গুলোতে জন্ম হয়েছে ইউরেশিয়া নামের বিশাল ভূ-খণ্ডটির পূর্বাংশের ভূ-খণ্ডগুলোর ক্রমাগত দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মোড় ফিরিয়ে সরে যাওয়া আর দক্ষিণ দিক থেকে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের উত্তর দিকে সরে আসার ব্যাপার। এই দুটো ভূ-খণ্ডের সাঁড়াশি আক্রমণের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে ভারত মহাসাগরের এই হাজার হাজার দ্বীপের।

আর তা ছাড়া এই ফিলিপাইন ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের এই অঞ্চলটি পৃথিবীর অন্যতম প্রধান আগ্নেয়গিরি বলয়েরও অংশ বিশেষ। এই অংশের সাগর-তলে রয়েছে হাজার হাজার জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। এই সব জীবন্ত আগ্নেয়গিরির লাভা জমে জমেই সৃষ্টি হয়েছে এই সব দ্বীপমালার।

ফিলিপাইনের এই হাজারো দ্বীপের মধ্যে একটি দ্বীপের কথা বলি। নাম তার ক্রাকাতোয়া। এটাও ছিলো একটি আগ্নেয়দ্বীপ। বুকে

ঘুমিয়েছিলো তার আগ্নেয়গিরির আগুন। একদিন কেমন করে ঘুম ভেঙ্গে গেলো সেই ঘুমন্ত আগ্নেয় দৈত্যের। ১৮৮৩ সালের ২৭শে আগস্ট তারিখে মাত্র কায়কদিনের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে কয়েক বর্গ কিলোমিটারের দ্বীপটি গেলো নিশ্চিহ্ন হয়ে। যে ঘটনা আজো সারা বিশ্বের সর্বকালের প্রচণ্ডতম প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা বলে চিহ্নিত হয়ে আছে।

কে জানে যদি অস্ট্রেলিয়া মহাদেশটি উত্তর দিকে সরে আসে এবং ইউরেশিয়া ভূ-খণ্ডটি আরো দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঘুরে আসে—তখন হয়তো একদিন আরো নতুন ভূ-খণ্ড জেগে উঠে দু'টি মহাদেশকেই একসূত্রে গেঁথে দেবে।

যেমন করে পানামা যোজক এক করে দিয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা নামের দু'টি বিশাল ভূ-খণ্ডকে।

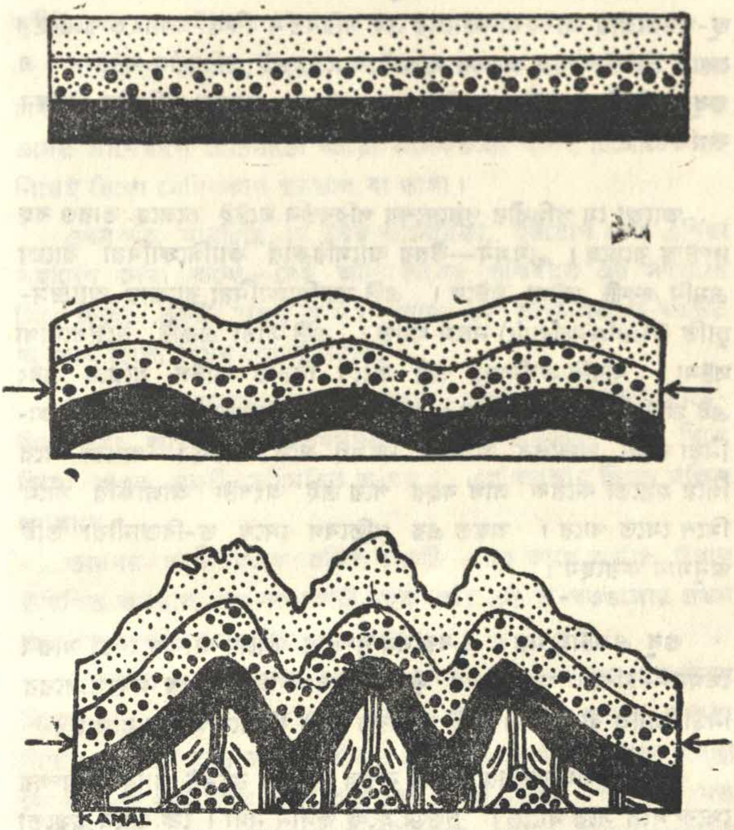
॥ ৪ ॥

কখনো কখনো আবার এমন হয়, যখন একটি ডাঙ্গা ভূ-খণ্ড চলতে চলতে অপর একটি ডুবন্ত ভূ খণ্ডের উপর চড়ে বসে। যদি সেই ডাঙ্গা ভূ-খণ্ডটির মাটি গ্রানাইট প্রধান হয় এবং ডুবন্ত ভূ-খণ্ডটি যদি ব্যাসল্ট বা কৃষ্ণবর্ণ শিলা দ্বারা গঠিত হয়, তখন হয় আরেক ব্যাপার। ডাঙ্গা ভূ-খণ্ডটির প্রচণ্ড চাপে ডুবন্ত ভূ-খণ্ডের কালো শিলা ধাক্কা খেয়ে উপর দিকে বেঁকে উঠে। এর ফলে সৃষ্টি হয় পাহাড়-পর্বতের। হাজার হাজার কিলোমিটার লম্বা হয় এই পর্বতমালা কখনো কখনো।

কিন্তু সবচেয়ে ভয়ানক কাণ্ড হয় যখন দু'টি ডাঙ্গা ভূ-খণ্ডের সংঘর্ষ হয়। এসব ক্ষেত্রে দুটো ভূ-খণ্ডেরেই প্রান্তদেশ উঁচু হয়। কেউ কাউকে দাবাতে পারে না। কখনো এই দুটো ভূ-খণ্ডের পারস্পারিক চাপে কোনো একটির ভূমি সহসা ভাঁজ খেয়ে উঠে যায় উপর দিকে।

আজ থেকে কয়েক কোটি বছর আগে আফ্রিকা মহাদেশটি যখন ইউ-রোপ মহাদেশকে চেপে ধরেছিলো আর এ দুটো বিশাল ভূ-খণ্ডের প্রচণ্ড চাপে ইউরোপ খণ্ডের দক্ষিণ অংশের ভূমি ভাঁজ খেয়ে উঠে গিয়েছিলো উপরের দিকে। আর এরই পরিণতিতে জন্ম হয় সারা ইউরোপের প্রধান পর্বতমালা—আল্‌পস পর্বতমালার (Alps Mountains)। সে প্রায় আজ থেকে তেরো কোটি বছর আগের ঘটনা।

তারপর আমাদের নিজ মহাদেশের হিমালয়ের কথা বলি এবার। হিমালয় পর্বতমালা অবশ্য ইউরোপের আল্‌পস পর্বতমালার প্রায় আট কোটি বছরের কনিষ্ঠ। বিশ্বের বৃহত্তম পর্বতমালা হিমালয়ের জন্ম হয়েছে আজ থেকে মাত্র পাঁচ সাড়ে পাঁচ কোটি বছর আগে।



এমনিভাবে দু'পাশের ক্রমশঃ প্রচণ্ড চাপে ভূমি ভাঁজ খেয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। সৃষ্টি হয় পর্বতশ্রেণীর।

এই হিমালয় পর্বতমালার জন্মের ইতিহাসও আলপস এর মতই। আজ থেকে পাঁচ কোটি বছর আগে প্রচণ্ড একটা চাপে এশিয়া মহাদেশের

দক্ষিণ পাশ বরাবর এই অংশটা ক্রমশঃ উপর দিকে ফুলে উঠতে থাকে। আর তারপর লাখো লাখো বছর ধরে উপর দিকে উঠতে উঠতে সৃষ্টি হয় বিশ্বের বিস্ময় এই হিমালয় পর্বতমালার।

মজার ব্যাপার হলো—শুধু হিমালয় নয়, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের ভূ-খণ্ডগুলোর আবহমানকালের এই পরিবর্তন কিন্তু অব্যাহত রয়েছে। কোটি কোটি বছর আগের মতোই আজো এই পরিবর্তন ঘটছে। এ শুধু পৃথিবীর অতীতের ইতিহাস নয়। এ হলো পৃথিবীর চিরন্তন কর্মকাণ্ড।

আজো যে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের পরিবর্তন ঘটেই চলেছে তারও বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন—উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে এমনি একটি ঘটনা ঘটছে। এটি ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের আন্দ্রেস-চ্যুতি (Andreasfault) নামে খ্যাত। এটি সত্যি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ক্যালিফোর্নিয়ার এই অংশে বিরাট ফাটল ধরেছে এবং এই ফাটল দিনে দিনে বড় হচ্ছে। সানফ্রান্সিস্কো থেকে ক্যালিফো-র্নিয়া রাজ্য অঞ্চলের অগ্রভাগ ক্রমেই সরে যাচ্ছে। আরো সরে গিয়ে হয়তো কয়েক লাখ বছর পরে এই অংশটা আলাস্কার সাথে মিশে যেতে পারে। অন্তত এর গতিবেগ দেখে ভূ-বিজ্ঞানীরা তাই অনুমান করছেন।

শুধু একটাই নয়। এ ধরনের দৃষ্টান্ত আরো অনেক দেয়া যায়। যেমন—এশিয়া মহাদেশের তুরস্ক এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের নিউজিল্যাণ্ড দ্বীপ। এ দু'টি স্থানেরও অংশ বিশেষে ফাটল ধরেছে।

এশিয়ার মধ্যপ্রাচ্যের জর্দান নদীর দু'তীর ক্রমেই নাকি পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। চওড়া হচ্ছে জর্দান নদী। কে জানে হয়তো আরো বড় হতে হতে আস্ত একটা লোহিত সাগর হয়ে যাবে কিনা। তা ওই লোহিত সাগরের অবস্থাও প্রায় একই। ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেন,—এই লোহিত সাগরের প্রশস্ততাও নাকি দিন দিন বাড়ছেই। অর্থাৎ আফ্রিকা মহাদেশটা ক্রমেই আরো সরে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে। বড় হচ্ছে লোহিত সাগর।

॥ ৫ ॥

ঠিক কতো যুগ আগে থেকে যে পৃথিবীর এই ভূ-ত্বকের প্লেটগুলো এমনভাবে নড়াচড়া করতে শুরু করেছে বিজ্ঞানীরা আজো তা সঠিক-ভাবে নির্ণয় করতে পারেননি। তবে অনুমান করা হয়—সেই পৃথিবীর প্রায় আদিকাল থেকেই শুরু হয়েছে এমন কাণ্ড। স্থলভাগের সৃষ্টির পর থেকেই প্রায়।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন,—আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে মাত্র তিনটি পৃথক মহাদেশ বা ভূ-খণ্ড ছিলো। অবশ্য এদের আশেপাশে ছোটখাটো আরো অনেকগুলো দ্বীপও ছিলো। এই নিয়েই ছিলো সেদিনকার স্থলভাগ বা ডাঙ্গা।

এখনকার মানচিত্রে, যে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়া মহাদেশ দেখা যাচ্ছে—সেই আদিাকালের পৃথিবীতে এর সবগুলো মিলে ছিলো একটি অখণ্ড ভূমি। আর এই সম্মিলিত ভূ-খণ্ডটির অবস্থান ছিলো বিষুব রেখার বরাবর।

অপরদিকে অন্যান্য ভূ-খণ্ড, যেমন—অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমে-রিকা এবং আজকের চিরতুষারের দেশ এ্যান্টার্কটিকা এরা মিলে ছিলো অপর একটি সম্মিলিত ভূ-খণ্ড। এর অবস্থান ছিলো দক্ষিণ গোলাধে।

তারপর আজ থেকে চল্লিশ কোটি বছর আগে অর্থাৎ উপরে উল্লিখিত অবস্থার প্রায় দশ কোটি বছর পরে এই ভূ-খণ্ডগুলোর প্রথম অবস্থানের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে।

দু'পাশের দুটি বিশাল ভূ-খণ্ড ক্রমশঃ এগুতে থাকে পরস্পরের দিকে এবং সুদীর্ঘ কাল ধরে পা পা করে এগুতে এগুতে এ দুটো বিশাল ভূ-খণ্ডই হয়ে যায় একত্রিত। এই দু'টি ভূ-খণ্ডের পৃথক অবস্থা থেকে একত্র হতে সময় লাগে প্রায় বিশ কোটি বছর। অনেকটা মস্ত বড় বিলের মাঝে ভাসমান কচুরীপানার দামের মতোই ভাসতে ভাসতে এসে একত্রিত হয়ে যায় সব।

বিজ্ঞানীরা এই একত্রিত ভূ-খণ্ডটির নাম দিয়েছেন প্যাংগায়া (Pangaea)। এই প্যাংগায়া একটি গ্রীক শব্দ। এর অর্থ হলো সম্মিলিত ভূ-খণ্ড বা অলল্যাণ্ড (All land)।

সমস্ত ভূ-খণ্ড মিলে গিয়ে—এই অলল্যাণ্ড নামের অখণ্ড ভূমির সৃষ্টি করেছিলো। এটা ছিলো সত্যি এক বিচিত্র আকৃতির। এগুলোর সন্নিবেশও খুব সুশৃংখল ছিলোনা। একেবারে এ্যাবড়ো থ্যাবড়ো অবস্থায় জোড়া লাগা একটা রূপ মাত্র। একটার গায়ের উপর আরেকটা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লে যেমন হয় তেমনি।

এই অবস্থায় উত্তর আমেরিকা এবং আফ্রিকা মহাদেশ পরস্পরকে চেপে ধরে প্রবলভাবে। ফলে আমেরিকা খণ্ডের এপাশের ভূমি ভাঁজ খেয়ে বেঁকে উঠে যায় উপরের দিকে। আর এরই ফলে জন্ম হয় আজকের এ্যাপালচিয়ান কলেডোনিয়ান (Appalachian Caledonian) পর্বতমালার।

এই পর্বতমালাটি স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া (Scandinavia) থেকে শুরু করে আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাংশ হয়ে চলে গেছে। এর অপর একটি শাখা রাশিয়া হয়ে ওক্‌লাহামা (Oklahama) পর্যন্ত বিস্তৃত।

এরপর আফ্রিকা এবং দক্ষিণাংশের ভূ-খণ্ডগুলো এসে চেপে ধরে উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপ মহাদেশকে। এর ফলে মাঝখানে যে বিস্তীর্ণ জলরাশি (বর্তমানের ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাদেশের উত্তরাংশ) ছিলো তা হয়ে যায় নিশ্চিহ্ন।

অপরদিকে এশিয়া মহাদেশের সাথে সংঘর্ষ হয় ইউরোপ মহাদেশের। এশিয়া মহাদেশটি সরে এসে প্রবলভাবে চেপে ধরে ইউরোপকে। আর এই চাপের ফলেই জন্ম হয় সাইবেরিয়ার ওর‍্যাল পর্বতমালার (Ural Mountains)।

এই প্যাংগায়া অবস্থার সময় পৃথিবীর জলবায়ু ছিলো উষ্ণ। এই উষ্ণতার কারণেই দক্ষিণের তুষার অঞ্চলেও এখানকার মতো এতো শীত ছিলো না। এই ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় সেখানে সাগরের তলদেশে জন্ম নিতে থাকে কোটি কোটি প্রবাল কীট।

এই প্রবাল কীট মরে গিয়ে সাগরের তলদেশে জমা হতে থাকে তাদের দেহাবশেষ। আর এই প্রবালের দেহনিঃসৃত তৈল থেকেই পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক খনিজ তেলের উৎপত্তি। আর এই প্রবাল কীটের দেহভস্ম জমে জমেও সৃষ্টি হয়েছে সাগরের বুকের অনেক

দ্বীপের ও দ্বীপপুঞ্জের। মহাসাগরের একদম নিবিড়তম স্থানের দ্বীপ মিনসোটা (Minnasota) এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

পৃথিবীর স্থলভাগের এই প্যাংগয়া অবস্থার বহু পূর্ব থেকেই লতাগুল্ম শৈবালের জন্ম হয়েছে। এই সময় গোটা পৃথিবী ছিলো বলতে গেলে এক বিশাল নিবিড় অরণ্যভূমি। তখন স্থলভাগে জন্মাতে শুরু করেছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব গাছপালা। পৃথিবীর ৪৫/৫০ ফুট লম্বা দৈত্যাকৃতির ফার্ন গাছের কথা তো অনেক বইতেই লেখা রয়েছে।

পৃথিবীর এই নিবিড় অরণ্যের বৃক্ষরাজির গলিত দেহ স্তূপীকৃত হয়েই মাটির নীচে জন্ম নিয়েছে রাশি রাশি পাথুরে কয়লার। মাটির নীচে পাথুরের কয়লার জন্মের ইতিহাস এটাই।

যখন থেকে পৃথিবীর বুকে বৃক্ষলতা জন্মাতে শুরু করেছে, সেই আদ্যিকালের কথা তখন থেকেই পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশেরও পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিলো।

এই গাছপালার জন্যই বায়ুর উপাদানেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। গাছ বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড টেনে নিয়ে অক্সিজেন ত্যাগ করে। আর এই অক্সিজেন হলো প্রানিকুলের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। সরাসরি বাতাসের এই অক্সিজেন ছাড়া স্থলচর প্রাণী বিশেষ করে বড় প্রাণী বাঁচতে পারে না। তাই দেখা গেলো স্থলভাগে বৃক্ষলতা গজিয়ে উঠার পর পরই এখানে আবির্ভাব ঘটলো প্রানিকুলের।

পৃথিবীতে প্যাংগায়া অবস্থার পূর্ব থেকেই যেমন বৃক্ষলতা ছিলো সেই সাথে ছিলো প্রানিকুলও। অবশ্য তখনও পৃথিবীতে মানবকুলের আবির্ভাব হয়নি। মানুষ পৃথিবীর কনিষ্ঠতম প্রাণী।

তারপর লাখো লাখো কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর বুকে চলেছে বিচিত্র সব প্রানিকুলের অবাধ রাজত্ব।

সরীসৃপ যুগের সেই দৈত্য প্রাণী ডাইনোসর। পর্বতপ্রমাণ ছিলো যাদের দেহাকৃতি। এদের অনেকে ছিলো ভয়ানক হিংস্রও।

আকাশচারী প্রানিদের মধ্যে ছিলো টেরোডাক্টাইল নামে পাখীর আকৃতি আর এক প্রকার দৈত্য প্রাণী। এরা ছিলো আজকের পালকবিশিষ্ট পাখীদের পূর্বপুরুষ। এই টেরোডাকটাইলদের এক

একটা এমন বড় ছিলো যে এদের পাখার দৈর্ঘ্য ছিলো প্রায় ৫০ ফুটেরও বেশী। অবশ্য এই দৈত্যরা আজ আর নেই। আদিযুগের সব প্রাণীরাই প্রায় বিলুপ্ত।

॥ ৬ ॥

এই যে পৃথিবীর প্যাংগায়া অবস্থার কথা বলছিলাম। সবগুলো ভূ-খণ্ড যখন একত্রিত এসে জড়ো হয়েছিলো।

সেই অতিকায় মহাদেশ বা সুপারকন্টিনেন্ট অবস্থার প্রথম ভাঙ্গন শুরু হয় আজ থেকে প্রায় বিশ কোটি বছর আগে।

প্যাংগায়ার প্রথম ফাটল ধরে এর মাঝ বরাবর। এর উত্তরের অংশে পড়ে আজকের উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়া মহাদেশ। এর বাদবাকী অংশ ছিলো আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং এ্যান্টার্কটিকা।



আজ থেকে বিশ কোটি বছর আগে ভূ-খণ্ডগুলোর অবস্থান ছিলো এরকম।

প্রথম ধরে বড় এই ভাঙ্গন। তারপর এই বড় দু'টি খণ্ডের মধ্যে আবার ধরে ভাঙ্গন। আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং এ্যান্টার্কটিকা মহাদেশগুলোও পরস্পর থেকে আলাদা হতে শুরু করে একসময়। প্রত্যেকে আলাদা হয়ে সরে যেতে থাকে দূরে।

সম্পূর্ণ পৃথক হতে সময় লাগে প্রায় সাড়ে চৌদ্দ কোটি বছর। তারপর আরো সরতে সরতে এই বর্তমান অবস্থায় পৌঁছতে সময় লাগে আরো সাড়ে পাঁচ কোটি বছর।

এই সময় আরো একটি মজার ব্যাপার হয়েছিলো। এখনতো আমরা মানচিত্রে দেখতে পাই উত্তর আমেরিকা আর দক্ষিণ আমেরিকা একত্র জোড়া লাগানো। পানামা যোজক এদের দুহাত একত্র করে দিয়েছে। কিন্তু কোটি কোটি বছর আগে এরা একত্রিত ছিলো না। একটা থেকে অন্যটার অবস্থান ছিলো অনেক দূরে। পরে দুটো মহাদেশই পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকা নামের ভূ-খণ্ডটি বেশী করে উত্তর দিকে এগিয়ে আসে। আর এ দুটো ভূ-খণ্ডের চাপে সাগরের তলদেশের মাটি ফুলে উঠে উপরের দিকে। সৃষ্টি হয় আশেপাশে অনেকগুলো দ্বীপের। তারপর অপর একটি ভূ-খণ্ডের জেগে ওঠার ফলেই দুটি মহাদেশ হয়ে যায় একত্রিত।

এদিকে ইউরেশিয়ান খণ্ডটি ঘড়ির কাটার বরাবর ঘুরে এর পূর্ব-উত্তর অংশ দক্ষিণ দিকে সরতে থাকে। অপর দিকে আফ্রিকা চাপ সৃষ্টি করতে থাকে ইউরেশিয়ার পশ্চিম দিকে। উল্লেখ্য যে, এই আফ্রিকা মহাদেশটি ঘুরছে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে।

বাকী দুটো মহাদেশ যথা অস্ট্রেলিয়া ও এ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ দুটির ভাংগন শুরু হয় আজ থেকে সাড়ে পাঁচ কোটি বছর আগে। এ দুটি মহাদেশের ভাংগনের জন্য দায়ী হলো দক্ষিণ মেরুর বরফ-শীতল জলরাশি। দক্ষিণ মেরুর প্রচণ্ড শীতল বরফের চাপের ফলেই দুটি ভূ-খণ্ডের ভাংগন ধরে। দক্ষিণ মেরুর শীতলতা যতোই বাড়তে থাকে এ অঞ্চলের আবহাওয়া ততই চরম আকার ধারণ করে। আর এরই চাপে ছুটে যাওয়া অস্ট্রেলিয়া মহাদেশটি আরো দ্রুত ছুটতে থাকে উত্তর দিকে। অপরদিকে শীতল আবহাওয়ার চাপে আরো উত্তর দিকে সরতে থাকে এন্টার্কটিকা মহাদেশটিও।

এই ভূ-খণ্ডের চলাচলের ফলে সবচেয়ে মজাদার সৃষ্টি হলো ভারত উপমহাদেশের জন্মের ইতিহাস। ভারত উপমহাদেশের এই

অংশটুকু নাকি আসলে আফ্রিকা মহাদেশেরই অংশ বিশেষ। এই অংশটুকু আফ্রিকা মহাদেশেরই শরীর থেকে ছিন্ন হয়ে লেগে পড়েছে এশিয়া খণ্ডের সাথে। সে প্রায় বারো কোটি বছর আগের ঘটনা।

এরপর অস্ট্রেলিয়া মহাদেশটি দ্রুত ছুটে আসতে থাকে এশিয়ার দিকে। এর ফলে প্রবল চাপের সৃষ্টি হয় এশিয়া মহাদেশের দিকে।

সেও প্রায় পাঁচ, সাড়ে পাঁচ কোটি বছর আগের ঘটনা। এই প্রচণ্ড চাপের ফলে ভারত উপমহাদেশের উত্তর বরাবর অংশের ভূমি ঠেলে উঠে উপর দিকে। সৃষ্টি হয় বিশ্বের বৃহত্তম হিমালয় পর্বতমালার। ভারত উপমহাদেশের এই খণ্ডিত অংশটি আজো নাকি ক্রমাগত উত্তর দিকে সরে যাচ্ছে। আর তার ফলে ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে হিমালয় পর্বতের নীচে।

আর অপরদিকে যতোই দিন যাচ্ছে ততই হিমালয় পর্বতও ফুলে ফেঁপে উঠছে উপরের দিকে। মাথা তুলছে আকাশের দিকে। গ্রাস করছে দক্ষিণের ভূ-খণ্ডকে অর্থাৎ ভারত উপমহাদেশকে। কে জানে হয়তো আজ থেকে কয়েক কোটি বছর পরে এই উপ-মহাদেশটাই গ্রাস করে ফেলবে সে। আর সেদিন পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যাবে আজকের ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলদেশ, নেপাল এবং বার্মা সহ দক্ষিণের সমস্ত ভূ-ভাগ।

এই আশংকার কথাটা অবশ্য স্বীকার করেছেন ভারতের অনেক বড় বড় ভূ-তত্ত্ববিদ্গণও। তাঁরাও অতি সূক্ষ্ম জরিপ চালিয়ে দেখে বলেছেন, হিমালয় পর্বতমালা সত্যি দিনে দিনে এগিয়ে আসছে দক্ষিণ দিকে। প্রতি বছর দেড় ইঞ্চি করে হিমালয় পর্বতমালা দক্ষিণ দিকে সরে আসছে। দেড় ইঞ্চি হলেও এই মাত্র কয়েক হাজার কিলো-মিটার পথ আসতে আর কত দিন লাগবে ?

॥ ৭ ॥

পৃথিবীর এই ভূ-খণ্ডগুলোর খামখেয়ালী চলাফেরার জন্য সবচেয়ে বেশী চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটছে ভূ-মধ্যসাগরকে নিয়ে। বিজ্ঞানীরা বলেন, জন্মের পর থেকে এই ভূ-মধ্যসাগরের এ পর্যন্ত তিনবার মৃত্যু হয়েছে এবং তিনবার পুনর্জন্ম হয়েছে। শুনতে হাস্যস্কর হলেও ঘটনাটা সত্যি ঘটেছিলো।

ভূ-মধ্যসাগরের এই জন্ম-মৃত্যুর জন্য দায়ী হলো আফ্রিকা মহাদেশ। এই আফ্রিকা মহাদেশটাই বারবার ছুটে এসে চেপে ধরেছে ইউরোপ মহাদেশকে। মাঝখানের এই সাগর অংশটা গেছে হারিয়ে। আবার যখন আফ্রিকা সরে গেছে অন্যদিকে তখন আবার জন্ম নিয়েছে তখনকার জলরাশি। এমনি ঘটনা ঘটেছে প্রায় বার তিনেক। এ ধরনের আজব ঘটনা পৃথিবীর আর কোথাও ঘটেনি।

আরো ঘটনা আছে। আফ্রিকা মহাদেশের চাপা খেয়ে শুধু যে ভূ-মধ্যসাগরেরই জন্ম-মৃত্যু ঘটেছে তাই নয়। এই আফ্রিকার চাপা খেয়েই এর পূর্ব তীর অংশে জন্ম নিয়েছে একটি সুদীর্ঘ পর্বতমালার।

আজকের সুইজারল্যাণ্ড থেকে ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত যে পর্বতমালা রয়েছে এরও জন্ম হয়েছে আফ্রিকা মহাদেশেরই চাপে। আর ইউরোপ মহাদেশে বিখ্যাত পর্বতমালা আল্‌পস্‌ পর্বতমালার দক্ষিণ ভাগে যে সমতল ভূ-ভাগ রয়েছে, বিজ্ঞানীরা বলেন,— সেটা নাকি আসলে আফ্রিকা মহাদেশেরই অংশ বিশেষ। যখন আফ্রিকা মহাদেশ ইউরোপকে চেপে ধরেছিলো তখন তো আফ্রিকার সাথে ইউরোপের ভূ-ভাগ মিশে গিয়েছিলো। তারপর যখন আফ্রিকা আবার সরে আসছিলো তখন এই অংশটুকু ছিঁড়ে ইউরোপ মহাদেশের সাথেই আটকে রয়ে গেছে। এই অংশটুকু এখন ইউরোপ মহাদেশেরই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটুকু আফ্রিকার অংশবিশেষ। ইউরোপের ইটালী ইত্যাদি অংশটুকু যেমন ভাবে ছিঁড়ে গিয়ে বাঁকা হয়ে ভূ-মধ্যসাগরের মাঝখানে এসেছে, এ দেখেই উপরের ঘটনার সত্যতা যাচাই করা যায়।

আফ্রিকা মহাদেশের এই অঙ্গচ্ছেদের ঘটনা আরো আছে। এই যে আজকের সৌদী আরব পারশ্য উপসাগর থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগ, এই অংশটাও আগে ছিলো আফ্রিকা মহাদেশেরই অংশ। এখন অবশ্য লোহিত সাগর এই অংশটাকে আলাদা করে ফেলেছে। আলাদা করে ফেলেছে আফ্রিকা মহাদেশকে এশিয়া মহাদেশ থেকে।

আফ্রিকা মহাদেশের পাগলামোর ফলে এই অঞ্চলে আরো একটি ঘটনা ঘটেছে। আজো এই ঘটনার প্রতিক্রিয়াই চলছে। অফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার সংঘর্ষের ফলেই এই অংশের মাটির নীচে সৃষ্টি হয়েছে অনেক আগ্নেয়গিরির। এই অঞ্চলে বারংবার ভূমিকম্প তার প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে থাকে, ক্ষতি করে লাখো জনবসতি আর জানমালের। মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক, ইরান, তুরস্ক, লেবানন, ইসরাইল, জর্দান ও ইটালী এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

এবার মানচিত্রের অপর পৃষ্ঠা খুলে দেখা যাক। এই পৃষ্ঠায় রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং এশিয়া। এই মহাদেশগুলোও, ক্রমে পরস্পরের দিকে সরে আসছে। আর তার ফলে ক্রমেই বিশ্বের বিশালতম প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তৃতি আসছে কমে।

আর এই চাপের ফলে ক্রমেই প্রশান্ত মহাসাগরের নীচেও জন্ম নিচ্ছে অনেক আগ্নেয়গিরির। আর এই ডুবন্ত আগ্নেয়গিরির লাভা জমে সৃষ্টি হচ্ছে অনেক নতুন নতুন দ্বীপের। মেক্সিকোর প্যারিকুটিন (Paricutin) এমনি একটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। ১৯৪৩ সালে এই জীবন্ত আগ্নেয়গিরিটির প্রলয়কাণ্ডে লাভা উৎক্ষিপ্ত হয়েছিলো প্রায় দু'হাজার ফুট উপর পর্যন্ত।

পৃথিবীর ভূ-খণ্ডগুলোর এই হাঁটাচলার ফলে যে শুধু ভূ-পৃষ্ঠের মানচিত্রেরই পরিবর্তন ঘটেছে তাই নয়, এর পৃষ্ঠদেশের প্রাণিকুলেরও অনেক বিচিত্র বিবর্তনও দেখা দিচ্ছে।

আদ্যিকালের সেই প্যাংগায়া অবস্থার কথাই বলি। তখন তো সারা বিশ্বের সমস্ত ভূ-খণ্ড ছিলো একত্রিত। তখন পৃথিবীর আদি অবস্থা হলেও তখনো পৃথিবীতে প্রাণী ছিলো। সেই প্রাণিকুল মুখরিত ও অরণ্যশোভিত বিশাল প্যাংগায়া খণ্ডের এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সবাই অবাধে যাতায়াত করতে পারতো। ফলে সব রকম প্রাণী কম বেশী সবখানে চলে যায়।

কে জানে আবার যদি পৃথিবী কোনদিন পূর্বের সেই প্যাংগায়া অবস্থায় ফিরে যায়, আবার হয়তো সবার সাথে পায়ে হেঁটেই দেখা করা যাবে।

মার্চ, ১৯৮২

হারিয়ে যাওয়া মহাদেশ

এখন আর তার কোনো অস্তিত্ব নেই।

হারিয়ে গেছে মহাসাগরের অতল তলে।

নাম ছিলো তার আটলান্টিস। সুজলা সুফলা পাহাড়-পর্বত ঘেরা প্রাণিকুল মুখরিত এই মহাদেশটি আটলান্টিক মহাসাগরের বুকেই জেগেছিলো বহুকাল আগে, কিন্তু আজ আর তার কোনো নাম নিশানাও নেই। অথচ একদিন নাকি সব ছিলো।

হারিয়ে যাওয়া এই ভূ-খণ্ডটির বুকে বাস করতো হাজার রকমের প্রাণী। মানুষও ছিলো। তাদের সভ্যতা ছিলো। অনেক উন্নতমানের সভ্যতা। রাজা ছিলেন। প্রজারা ছিলো। আর ছিলেন তাদের দেবতা। সুখ-শান্তি সবই ছিলো তাদের।

কিন্তু থাকলো না। একদিন কেমন করে সব ধ্বংস হয়ে গেলো। হারিয়ে গেলো গোটা মহাদেশটাই মহাসাগরের অতল তলে।

আটলান্টিক মহাসাগরের বুকেই ছিলো তার অস্তিত্ব। আর তাতেই হয়তো তার নাম হয়েছিলো আটলান্টিস। সাগরের নামেই হয়েছিলো তার নাম। কে জানে এর উল্টোটাও হয়েছিলো কিনা। অর্থাৎ ওই আটলান্টিস মহাদেশটার নাম থেকেই তার সাগরের নাম আটলান্টিক হয়েছিলো কিনা। এর সঠিক ইতিহাস কারো জানা নেই।

আজকের যুগের সভ্য মানুষেরা জানতো না সত্যি সত্যি কোথায় ছিলো সেই হারিয়ে যাওয়া মহাদেশটি। সর্বপ্রথম যিনি এর নামটি উল্লেখ করেন, তিনি হলেন মহান দার্শনিক প্লেটো। তিনিই প্রথম তাঁর একটি বইতে এই মহাদেশটি সম্পর্কে কিছুটা বিশদ বর্ণনা দেন।

প্লেটোর বর্ণনা মতে, অনেক অনেক কাল আগে আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর অংশে হার্কুলেস প্রণালীর ঠিক সামনেই ছিলো এই আটলান্টিস মহাদেশটি। মস্ত বড় একটি ভূ-খণ্ড। এর

আয়তন ছিলো আজকের আফ্রিকার লিবিয়াসহ গোটা এশিয়া মাইনরের চেয়েও বড়। দুলাখ আটচল্লিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার ছিলো এর আয়তন।

এখানে একটা কথা বলে নিই। ওই যে হার্কুলেস প্রণালীর নাম বললাম, ওই হার্কুলেস প্রণালী হলো আজকের জিব্রল্টার প্রণালী।

আটলান্টিস এর লোক সংখ্যাও কম ছিলো না। প্রায় দু'কোটি লোকের বসবাস ছিলো এখানে।

জলবায়ু ছিলো নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলীয়। না শীত, না গরম। ভারী চমৎকার ছিলো আবহাওয়া।

মহাদেশটির উত্তরে উঁচু পর্বত। গোটা উত্তর এলাকা ছিলো পর্বতঘেরা। ঠিক আমাদের ভারত উপমহাদেশের মতো। ভারত উপমহাদেশের যেমন গোটা উত্তর অংশ জুড়েই রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম ও উচ্চতম হিমালয় পর্বতমালা, তেমনি এই আটলান্টিস মহাদেশের উত্তরেও দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে ছিলো একটি পর্বতমালা।

আর এই পর্বতমালার সবচেয়ে উঁচু চূড়াতেই বাস করতেন আটলান্টিস মহাদেশের দেবতা আটলান্টিনস্ (Atlanteans)।

বনে বনে ছিলো হাজার রকমের ফুল ফল পাখ-পাখালি। গভীর বনে ছিলো অফ্রিকার হাতীসহ অনেক বড় বড় জীবজন্তু।

সারা মহাদেশ জুড়ে উৎপন্ন হতো প্রচুর ফসল। কৃষি ক্ষেত-খামারে সেচ দেওয়ার জন্যে তৈরি করা হয়েছিলো নদীনালা।

সুন্দর সুন্দর চোখ ধাঁধানো রঙে ঝলমল করতো রাজধানীর সব দালান-কোঠা। মহামূল্যবান হীরা-মণি-মুক্তো দিয়ে সাজানো হয়েছিলো দেবতা আটলানটিনস-এর মন্দির। দেশের, সর্বত্র ছিলো সুখ আর সমৃদ্ধি। রাজা, প্রজা, সবার মুখে ছিলো হাসি, বুকে ছিলো সুখ।

এই যে সুখ আর আনন্দের সংসার, সোনার দেশ, এট কতো, বছর আগে ছিলো মহান দার্শনিক প্লেটো তারও একটি হিসেব দিয়েছেন। প্লেটোর মতে খ্রীস্টপূর্ব ১২,০০০ থেকে ৯,০০০ এর মধ্যে বিদ্যমান ছিলো এই প্রাচীন সভ্যতাটি। এই সময়টার মধ্যে এরা ছিলো সারা বিশ্বের প্রায় সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি।

শক্তিশালী জাতির যা স্বভাব হয় এদেরও তাই ছিলো। এককালে ব্রিটিশ, পর্তুগীজ, স্পেন আর ফ্রান্স ছিলো সারা বিশ্বের সেরা শক্তিশালী জাতি। এরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ দখল করে সেখানে স্থাপন করেছিলো উপনিবেশ। এই আমরাও তো প্রায় দু'শো বছর ছিলাম ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে। এই এদের মতোই শক্তিশালী দেশ আটলান্টিসও আদ্যিকালে আফ্রিকা এবং ইউরোপের বহু অংশে স্থাপন করেছিলো তাদের উপনিবেশ।

আফ্রিকার উত্তর উপকূল লিবিয়া, মিসর, তারপর ভূ-মধ্য-সাগরের এপারে স্পেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল সহ প্রায় গোটা ভূ-মধ্য-সাগরীয় অঞ্চলেই ছিলো আটলান্টিসদের উপনিবেশ। ওরা ক্রমে আরো পূর্ব দিকে এসে বাধা পেয়েছিলো প্রাচীন সুসভ্য জাতি গ্রীকদের হাতে। গ্রীকরাই ওদের পিছু হটতে বাধ্য করেছিলো।

উপরে এতোক্ষণ আটলান্টিস মহাদেশের যে বর্ণনা দিলাম এটা ছিলো মহান দার্শনিক প্লেটোর বর্ণনা। তিনি তাঁর বইতে ঠিক এমনিভাবেই তুলে ধরেছিলেন আটলান্টিসকে।

॥ ২ ॥

প্লেটোর মৃত্যুর পর এই আটলান্টিস মহাদেশের কথাটাও প্রায় চাপা পড়ে গিয়েছিলো। এ নিয়ে সাধারণ মানুষ আর কেউ বড় একটা মাথা ঘামায়নি। অনেকে মনে করতেন এটা হয়তো দার্শনিক প্লেটোর কাল্পনিক একটি কাহিনী মাত্র। দার্শনিক প্লেটোর দর্শন তত্ত্বভিত্তিক গল্পবিশেষ। বাস্তবে হয়তো এর কোন অস্তিত্ব নেই।

কিন্তু সাধারণ মানুষ সহজে ঝেড়ে ফেলে দিলেও প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ কথাটি সহজে ভুলতে পারলেন না। তারা এই হারিয়ে যাওয়া ভূ-খণ্ডটির রহস্য সন্ধানে গবেষণা চালিয়েই যেতে লাগলেন। লেখা হতে লাগলো শত শত গ্রন্থ আর প্রবন্ধ। শোনা যায়, হারিয়ে যাওয়া এই অচেনা অদেখা রহস্যময় দেশটি নিয়ে এ পর্যন্ত প্রায় হাজার দশেক গ্রন্থ কিংবা প্রবন্ধ লেখা হয়ে গেছে।

কিন্তু এই দশ হাজারের মধ্যে একটি বই সবচেয়ে বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই বইটির নাম হলো 'The Secret of Atlantis' বাইটির লেখক হলেন আটো হেন্‌রিজ মোখ (Otto Heinrich Muck) নামে এক ভদ্রলোক।

বইটি প্রকাশিত হয়েছে অল্প কিছুদিন আগে। গত ১৯৭৬ সালে জার্মানীর একটি প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশ করেছে বইটি।

প্রকাশেরও প্রায় বছর তিরিশেক আগে লেখা হয়েছিলো বইটি। আরো মজার ব্যাপার হলো—বইটি প্রকাশ হবারও প্রায় বিশ বছর আগেই লেখক আটো হেন্‌রিজ মোখ নিজেও মারা যান।

হেন্‌রিজ মোখ পেশায় ছিলেন একজন প্রকৌশলী। তিনি ছিলেন ভিয়েনার অধিবাসী। সারা দেশ জুড়ে ছিলো তাঁর পাণ্ডিত্যের সুনাম। ভূ-তত্ত্ব এবং ইতিহাসেও ছিলো তাঁর অগাধ জ্ঞান।

মহান দার্শনিক প্লেটোর আটলান্টিস সম্পর্কিত কাহিনীটিও তিনি পড়েছিলেন। অদেখা রহস্যময় আটলান্টিসের কাহিনী আগেই তাঁর মনে কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিলো।

অবশ্য এই আটলান্টিস নিয়ে যে তিনি নিজেও এমন করে গবেষণা করতে শুরু করবেন এবং এর উপরে বই লিখে ফেলবেন, তা অবশ্য কখনো ভাবেননি।

এই হারিয়ে যাওয়া আটলান্টিস সম্পর্কে নতুন করে তার মনে কৌতূহল সৃষ্টি হওয়ার পেছনে ছিলো অন্য একটি ঘটনা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন জার্মান নৌ-বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তাঁর দায়িত্ব ছিলো উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবোজাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ানো। শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য রাখা এবং তাকে ঘায়েল করা।

এই উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতেই আবার নতুন করে তাঁর মনে পড়েছিলো প্লেটোর কথা। প্লেটোর আটলান্টিস মহাদেশের কথা।

তিনি সাগরের তলদেশে চালাতে লাগলেন গবেষণা। শত্রুর ডুবোজাহাজ লক্ষ্য রাখতে রাখতেই তিনি চালাতে লাগলেন হারিয়ে যাওয়া আটলান্টিস মহাদেশের ধ্বংসাবশেষের অনুসন্ধান।

শুধু প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানই নয়। তিনি এই রহস্যময় আটলান্টিস মহাদেশের উপর যত প্রবন্ধ বা পুস্তক-পুস্তিকা বের হয়েছে সে সমস্তও সংগ্রহ করে শুরু করলেন পড়াশোনা। ডুবোজাহাজের ভিতরেই চললো তার গবেষণা।

মিঃ হেনরিজ মোখ মেনে নিলেন দার্শনিক প্লেটোর বর্ণনা। কিন্তু তিনি তাঁর বিপক্ষে দাড় করাতে লাগলেন যুক্তি।

প্লেটো বলেছেন,—আটলান্টিস মহাদেশের অবস্থান ছিলো হার্কুলেস প্রণালী বা জিব্রাল্টার প্রণালীর পশ্চিম দিকে ইউরোপের মূল ভূ-খণ্ড থেকে ১২০৭ কিলোমিটার (৭৫০ মাইল) দূরে। প্লেটো আরো বলেছেন,—আটলান্টিস মহাদেশে ছিলো উন্নতমানের সভ্যতা। এরা পশ্চিম ইউরোপে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলো।

হেনরিজ মোখ যুক্তি দিতে লাগলেন,—যদি তারা ইউরোপে উপনিবেশ স্থাপন করে থাকে তবে তার কিছু কিছু নিদর্শন নিশ্চয়ই এখনো পাওয়া যাবে। তাদের বংশধরেরা আজো হয়তো কোনো না কোনো ভাবে আছেই। তিনি তখন এই বিষয়টিই পুঙখানু-পুঙখভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে লাগলেন।

আটলান্টিসের অধিবাসীরা ছিলো উন্নত সভ্যতার অধিকারী। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপ অর্থাৎ স্পেন, পর্তুগাল ও ফ্রান্সে যেসব প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে তা ছিলো খুবই অনুন্নত। প্রায় প্রস্তর যুগের নমুনা। এটা ছিলো নাণ্ডারথালম্যান (Nanderthalman) সভ্যতা।

তবে এরই পাশাপাশি মিঃ হেনরিজ মোখ আরো একটি উন্নত সভ্যতার সন্ধান পেলেন। এটা ছিলো ক্রো-ম্যাগননম্যান (Cro Magnon-man)-দের সভ্যতা।

এই ক্রো-ম্যাগননম্যানরা ছিলো গায়-গতরে অপেক্ষাকৃত বড় এবং অভিজাত বংশোদ্ভূত। স্পেনে ও ফ্রান্সে এদের যে সভ্যতার নিদর্শন তিনি পেয়েছেন তা বেশ উন্নত ও চমৎকার।

এরা ধাতব পদার্থের উন্নত ব্যবহার জানতো। সোনা-রূপা, মণিমুক্তা ও বহু মূল্যবান ধাতব পদার্থও তারা ব্যবহার করতো।

কিন্তু ক্রো-ম্যাগননম্যানদের আদি সভ্যতার কোনো নিদর্শন কোথাও পাওয়া যায়নি। এদের সভ্যতার আদি সূত্রের কোথাও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

তাই হেনরিজ মোথ ধারণা করলেন—এই ক্রো-ম্যাগননম্যানদের সভ্যতার আদি নিদর্শন হয়তো রয়েছে আরো পশ্চিমে। এরা হয়তো এসেছে সুদূর পশ্চিম দিক থেকে। সেই আরো পশ্চিম বলতে তো আটলান্টিস মহাদেশকেই বোঝায়।

॥ ৩ ॥

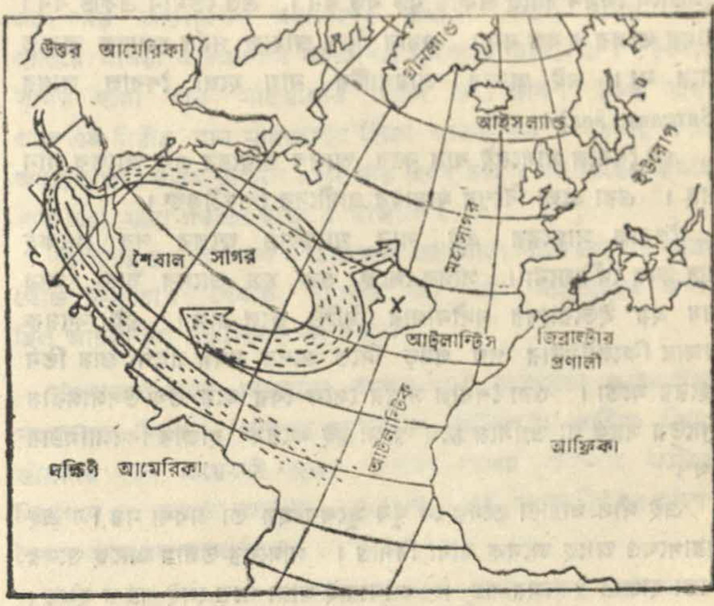
আটলান্টিসের অস্তিত্বের স্বপক্ষে আরো কিছু কিছু প্রমাণ আছে। এবার এই প্রমাণগুলোও একটি একটি করে আলোচনা করে দেখা যাক।

এখন ইউরোপের পশ্চিম তীর বরফমুক্ত। সেখানে প্রবাহিত হচ্ছে উষ্ণ জলরাশি। কিন্তু খ্রীস্টপূর্ব এগারো হাজার বছর আগে সেখানকার অবস্থা ছিলো ভিন্ন রকম। তখন ইউরোপের পশ্চিম অংশটা ছিলো গোটাটাই বরফে ঢাকা। প্রবাহিত হতো হিমবাহ। কিন্তু সেই প্রচণ্ড অবস্থা এখন কেটে গেছে।

কিন্তু এর কারণ কি? হাজার হাজার বছর আগে যেখানে ছিলো বরফ ঢাকা এখন তা মুক্ত হলো কেমন করে? আজকের ইউরোপের পশ্চিম তীর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত (Gulf stream)—এই উষ্ণস্রোতের জন্যই ওখানকার বরফাচ্ছন্নতা কেটে গেছে।

এই উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত মেক্সিকো উপসাগর থেকে বের হয়ে উত্তর আমেরিকার পূর্ব গাঁ ঘেঁষে কিছুদূর উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে উত্তর দিক থেকে আসা শীতল লাব্রাডার স্রোতের বাধা পেয়ে মোড় নেয় পূর্ব দিকে। তার পরে সোজা এসে পড়ে আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্বপ্রান্তে ইউরোপ মহাদেশের তীরে। এই স্রোতে বয়ে আনে উষ্ণ জলরাশি। আর এরই ফলে ইউরোপের পশ্চিম তীরে আজকাল আর বরফ জমে না।

কিন্তু খ্রীস্টপূর্ব দশ এগারো হাজার বছর আগে এমন হতো না। এই উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতটি সোজা ইউরোপের পশ্চিম তীর



চিত্রে আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর অংশ দেখানো হয়েছে। মোটা তীর চিহ্নটি হলো উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত। এটি চিত্রের ক্রস (×) চিহ্নিত ভূ-খণ্ড অর্থাৎ আটলান্টিসে বাধা পেয়ে দুদিকে ভাগ হয়ে যেতো।

পর্যন্ত এসে পৌঁছাতেই পারতো না। মাঝ পথে কোন কিছুর সাথে বাধা পেয়ে ফিরে যেতো ভিন্ন দিকে।

এই কোনো কিছু বলতে কোন বিশাল ভূ-খণ্ডকেই বোঝায়। আর সেই ভূ-খণ্ডটি হলো হারিয়ে যাওয়া মহাদেশ আটলান্টিস। এই আটলান্টিসের সাথে ধাক্কা খেয়েই উষ্ণ উপসাগরীর স্রোতটি সরে যেতো দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে। ফলে ইউরোপ মহাদেশের পশ্চিম অংশটা আড়ালে পড়ে থাকতো আর তারই ফলে এখানে নেমে আসতো প্রচণ্ড শীত।

এবার পরীক্ষা করে দেখা যাক অন্য একটি প্রমাণ। এটি হলো আটলান্টিক মহাসাগরের এক বিচিত্র ধরনের বান মাছের গল্প।

আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে আছে একটি আজব জায়গা। সাগরের তলদেশে আছে একটি আগাছা ভরা জংলা-জায়গা। আমাদের স্থলভাগে যেমন আছে প্রকাণ্ড বড় বড় বন। এও তেমনি একটি বন। সাগর তলের ডুবন্ত বন। এখান দিয়ে জাহাজ পর্যন্ত চলাচল করতে পারে না। এই আজব জায়গাটির নাম হলো শৈবাল সাগর (Sargasso sea)।

এই শৈবাল সাগরেই বাস করে আজব চরিত্রের এক জাতের বান মাছ। এরা হলো বিশ্বের যাযাবর প্রাণীদের গোষ্ঠীভুক্ত।

শৈবাল সাগরের এই বান মাছেরাও জন্মের পর থেকেই শুরু করে দৌড়ানো। সাগর থেকে শুরু হয় তাদের যাত্রা, আর শেষ হয় ইউরোপের নদীনালার মিষ্টি জলে এসে। এই কয়েক হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে ওদের সময় লাগে প্রায় তিন বছরের মতো। ওরা শৈবাল সাগর থেকে বের হয়ে উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের সাথে গা ভাসিয়ে চলে আসে এই কয়েক হাজার কিলোমিটার পথ।

এই দীর্ঘ যাত্রাটা ওদের যে খুব সুখের হয় তা অবশ্য নয়। এই যাত্রাপথেও আছে অনেক বাধা বিপত্তি। সাগরের তলায় আছে ওদের কতো হাজার রকমের শত্রু। অনেকেই মারা পড়ে সেই শত্রুর হাতে। ফলে যারা যাত্রা করে তারা খুব কম সংখ্যাই এসে পেঁৗছতে পারে শেষ মাথায়।

কিন্তু ওদের এই মৃত্যুভয় বলে কোনো কিছু নেই। এই দৌড়ানো ওদের অভ্যাস। ওরা আসবেই।

তারপর ইউরোপের নদীনালার মিষ্টি জলে কাটিয়ে দেয় জীবনের আর দশ-পনোরোটা বছর। তারপর আবার শুরু হয় ফিরতি দৌড়। শেষ হয় গিয়ে আবার সেই শৈবাল সাগরে। তারপর ডিম পাড়ে। বাচ্চা ফোটে। বাচ্চাদের আবার শুরু হয় দৌড়। আর মায়েরা বুড়ো হয়ে জমায় পরপারে পাড়ি। এই হলো ওদের বিচিত্র জীবন।

কিন্তু আটলান্টিস মহাদেশের কথা বলতে গিয়ে শৈবাল সাগরের বান মাছের কথা কেনো টেনে আনলাম এবার সেকথা বলছি।

শৈবাল সাগরের বান মাছগুলোর এমন বোকার মতো দৌড়ানোর অভ্যাস কেনো হলো, এ কথার উত্তর দিতে গেলেই এসে পড়ে আটলান্টিস মহাদেশের কথা। শৈবাল সাগর থেকে হারিয়ে যাওয়া আটলান্টিস মহাদেশটি খুব দূরে ছিলো না। শৈবাল সাগর হলো বান মাছগুলোর আদি জন্ম স্থান। কিন্তু সাগর তলে এই নিরীহ বান মাছগুলোর ছিলো অনেক শত্রু। সাগর তলে আছে হাজার রকম রাক্ষুসে প্রাণী আর হিংস্র মাছ। এই মাছের কবলে পড়ে এরা মারা পড়তো হাজারে হাজারে।

তাই শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য এরা আশে পাশে কোথাও আশ্রয় খোঁজ করতো। শৈবাল সাগরের এই বান মাছগুলোর আশ্রয় ছিল আটলন্টিস মহাদেশের নদীনালা।

শৈবাল সাগরের মাছগুলো জন্মের পরই দোড়াতো আটলান্টিস মহাদেশের দিকে। তারপর এখানকার নদীনালায় কাটিয়ে দিতো জীবনের বেশ কয়েকটি বছর। এখানে ওদের জীবনটা কাটতো নিরাপদে। তারপর আবার এক সময় ফিরে যেতো নিজের দেশে। শৈবাল সাগরের জন্মভূমিতে।

এই সময় থেকেই তাদের জন্মের পরই দৌড় শুরু করার অভ্যাসটা গড়ে ওঠে। তারপর ধীরে ধীরে এই অভ্যাস পরিণত হয় বংশগত ঐতিহ্যে।

একদিন আটলান্টিস মহাদেশটি ধ্বংস হয়ে গেলো। যেখানে ছিলো আস্ত একটি ভ-খণ্ড, সেখানে জন্ম হলো সাগরের। তাহলেও শৈবাল সাগরের বান মাছদের দৌড়ানোর অভ্যাসের কোনো পরিবর্তন হলো না।

ওরা আগের মতোই জন্মের পরই আশ্রয় নেয়ার জন্য ছুটলো আটলান্টিস মহাদেশের নদীনালার দিকে। আটলান্টিস তো আর তখন নেই, তবু তাকেই খুঁজতে খুঁজতে ওরা এসে পড়লো হাজার হাজার কিলোমিটার পথ। একেবারে ইউরোপ মহাদেশের তীরে। ওদের কাছে এখন এই ইউরোপই আটলান্টিস। এই ইউরোপের নদী-নালাতেই ওরা এখন আশ্রয় নেয়। ওরা তো আর জানে না যে, ওদের আগের সেই আশ্রয়টা এখন আর নেই।

আটলান্টিসের অস্তিত্বের পক্ষে আরো কিছু চমৎকার তথ্য-প্রমাণ আছে।

এখনকার মানচিত্রে দেখা যায় ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ থেকে আমেরিকা মহাদেশের অবস্থান অনেক দূরে। এদের মাঝে আছে বিশাল আটলান্টিক মহাসাগর। ইউরোপ ও আফ্রিকার মূল ভূ-খণ্ডের কাছে আমেরিকা একটি সম্পূর্ণ নতুন ভূ-খণ্ড।

মজার ব্যাপার হলো—এই দুটি মহাদেশের লোকদের মাঝে এমন কিছু আশ্চর্য মিল রয়েছে, তাতে মনে হয় হয়তো কোনো এককালে এই মহাদেশ দুটোর সাথে কোনো না কোনোভাবে যোগাযোগ ছিলো। তা না হলে এই সাদৃশ্য এলো কেমন করে?

যেমন—আফ্রিকার মিশরকে বলা হয় পিরামিডের দেশ। সাধারণ লোকের ধারণা মিশর ছাড়া আর কোথাও পিরামিড নেই। কিন্তু এটা সত্যি নয়। মিশরের মতো মধ্য আমেরিকার মেক্সিকোতেও অনুরূপ পিরামিড আছে। বিশ্বের বৃহত্তম পিরামিডটি এই মেক্সিকোতেই অবস্থিত। এই পিরামিডগুলোও অবিকল মিশরের পিরামিডের মতোই। অনেকটা একই কায়দায় তৈরি।

তাহলে প্রশ্ন জাগে এই সাদৃশ্য এলো কেমন করে? নিশ্চয়ই কোনো না কোনো সময় এই দুটি ভূ-খণ্ডের মধ্যে যোগাযোগ ছিলো। তার ফলেই এই প্রযুক্তিবিদ্যারও বিনিময় ঘটেছে।

শুধু পিরামিডই নয়। আরো অনেক ক্ষেত্রে একই ধরনের সাদৃশ্য আছে। যেমন—ইউরোপের স্পেনে বাস্কোস (Basques) বলে একটি উপজাতি আছে। স্পেনের এই বাস্কোসদের সাথে মধ্য আমেরিকার মায়া (Mayan) উপজাতির অনেক বিষয়ে মিল আছে। তাহলে এ দুটো উপজাতি-ই কি এককালে একই গোষ্ঠী-ভুক্ত ছিলো? এদের সাথে তাহলে কি একসময় যোগাযোগ ছিলো? মধ্য আমেরিকার এই মায়াদের একটি উপজাতি এখনো গোয়াতেমালার এক নিবিড় অঞ্চলে বাস করছে।

স্পেনের বাস্কোসদের একটি জাতীয় মজার খেলা আছে। খেলাটার নাম হলো পেলোটা (pelota). দু'জনের খেলা। একটি শক্ত কাঠের বল নিয়ে দু'জনে খেলতে হয়। ঠিক অনুরূপ একটি খেলা

প্রচলিত আছে গুয়াতেমালার এই উপজাতিদের মধ্যেও। এই সাদৃশ্য কেমন করে হচ্ছে ?

এই মিলের রহস্য সন্ধান করতে গিয়েও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই আটলান্টিসের কথা বলেছেন। সুদূর অতীতে এমন একদিন ছিলো যখন আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে জেগেছিলো এক বিশাল ভূ-খণ্ড। আটলান্টিস নামে একটি বিশাল মহাদেশ।

আটলান্টিস মহাদেশটি তার দু'পাশের দুটি প্রকাণ্ড স্থলভাগ অর্থাৎ পূর্বে ইউরোপ ও আফ্রিকা এবং পশ্চিম পাশের দুটো আমেরিকা এদের সাথে সেতুবন্ধের কাজ করতো। এককালে পুরনো পৃথিবী অর্থাৎ ইউরোপ আফ্রিকা থেকে মানুষ, জীবজন্তু আটলান্টিস মহাদেশের মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারতো আমেরিকাতে। আর তার ফলেই এক দেশের সভ্যতা, প্রাণী চলে গেছে আরেক দেশে।

প্রাকৃতিক কারণে ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন হয়েছে, তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মিশরের পিরামিড তৈরি করতে জানা লোক এমনি করেই হয়তো মেক্সিকোতেও গেছে।

॥ ৪ ॥

এতো গেলো যুক্তি-তর্কের কথা। আটলান্টিস মহাদেশ যে সত্যি সত্যি ছিলো তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই। যদি সাগরের বুকে সত্যি এককালে এর অস্তিত্ব ছিলোই, তাহলে সেখানে এখনো নিশ্চয়ই কোনো না কোনো প্রমাণ বা চিহ্ন আছে।

তা নিশ্চয়ই আছে। ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণ তার প্রমাণ পেয়েছেনও। সমুদ্রবিদ্যা (Oceanography) মানুষকে সাগর তলের অনেক অজানা রহস্য উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করেছে। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে মানুষ আজ সাগরের তলদেশের ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছে। মানুষ সাগরতলের মানচিত্রও অঙ্কন করছে।

উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশের মানচিত্রে দেখা যায়—এই মহাসাগরটির উত্তর অঞ্চলের তলদেশে গড়ে নয় হাজার ফুট উঁচু একটি পর্বতমালা রয়েছে। পর্বতমালাটি উত্তরে আইসল্যাণ্ড

(Iceland) থেকে দক্ষিণে কথিত আটলান্টিক পর্যন্ত বিস্তৃত। ডুবন্ত পর্বতমালাটি চওড়ায় প্রায় তিনশো কিলোমিটার (আড়াই শো মাইল) আর লম্বায় এক হাজার নব্বই কিলোমিটার (ছয় শো আটাত্তর মাইল।) এই পর্বতমালাটি ধ্বংসপ্রাপ্ত আটলান্টিস মহাদেশেরই শেষ চিহ্ন বলে ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন।

এছাড়াও আরো অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে চার্লস্টোন (Charleston) বলে একটা জায়গা আছে। গত ১৯৩০ সালে ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সেখানকার সাগরের তলদেশের একটা ছবি তুলেছেন।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে—সেখানকার সাগরের তলদেশ একেবারে ক্ষতবিক্ষত। যেনো একটি যুদ্ধক্ষেত্র। অজস্র বোমাবর্ষণের আঘাত সর্বত্রই। এখানকার সাগরের তলদেশে প্রায় তিন হাজার গোলাকার ক্ষত রয়েছে। যা দেখলে মনে হয় যেনো এক একটি আগ্নেয়-গিরির জ্বালামুখ। এই ক্ষতবিক্ষত অঞ্চলটি চার্লস্টোন উপকূল থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই ক্ষতগুলোর আবার একটি মজার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। দেখা যাচ্ছে সবগুলো ক্ষতেরই মুখ সামান্য উত্তর-পশ্চিম দিকে ফেরানো। দেখলেই বোঝা যায় হয়তো উত্তর-পশ্চিম আকাশ থেকে ভারী কিছু নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে এই ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে।

এই চার্লস্টোন উপকূল থেকে দূরে সাগরের তলদেশেই রয়েছে আরো একটি প্রকাণ্ড গহ্বর। বিখ্যাত এই গহ্বরটির নাম হলো পুর্টোরিকো গহ্বর (Purto Rico trench). এই বিশাল গহ্বর-টির গভীরতা হলো তিরিশ হাজার ফুট আর এর পরিধি হলো দু'লাখ সাতাত্তর হাজার কিলোমিটার।

সবারই বিস্ময়—সাগরের তলদেশে এই বিশাল গহ্বরটির জন্ম হলো কিভাবে ? আর অতগুলো ক্ষতের সৃষ্টি হওয়ারই বা কি কারণ ?

ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন এই অজস্র ক্ষত আর পুর্টোরিকো গহ্বরের জন্ম-রহস্যের মধ্যেই লুকানো আছে আটলান্টিস মহা-দেশটির হারিয়ে যাওয়ার মূল কথা।

আটলান্টিস মহাদেশটির হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কে মহান দার্শনিক প্লেটো বলেছেন,—মাত্র এক রাতের একটি ধ্বংসলীলার ফলেই এই বিশাল মহাদেশটি হারিয়ে গেছে সাগরের অতল তলে। প্লেটোর বিশ্বাস,—এই ধ্বংস লীলার জন্য দায়ী হলো মহাকাশ থেকে খসে পড়া একটি তারা। একটি তারা সহসা মহাকাশের গা থোক খসে পড়ে এই মহাদেশটির ওপর। আর তার ফলেই গোটা পৃথিবীতে ধরে যায় আগুন। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার এক প্রলয়কাণ্ডে ধ্বংস হয়ে যায় আটলান্টিস নামের আস্ত একটি মহাদেশ।

তবে আধুনিক বিজ্ঞানীরা—বিশেষ করে গ্রন্থের লেখক অটো হেনরিজ মোখ মনে করেন,—মহান দার্শনিক প্লেটোর কথা আংশিক সত্য। হয়তো মহাকাশ থেকে ভারী এবং জ্বলন্ত কোনো বস্তুর পতনের ফলেই এই ধ্বংসলীলা সাধিত হয়েছিলো। কিন্তু প্লেটো যে তারার কথা বলেছেন তা হয়তো ঠিক নয়। কারণ মহাকাশের গা থেকে তারা কখনো খসে পড়তে পারে না। তাই প্লেটোর কথিত তারাটি সম্ভবত মহাকাশের কক্ষচ্যুত কোনো গ্রহকণিকা (Asteroid)। মোখ সাহেবের মতে এই গ্রহকণিকাটি এডোনিস গোত্রের (Adonis Group)।

আমরা জানি, সৌর জগতের গ্রহগুলো যথানিয়মে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এই গ্রহগুলোর সাথেই মহাকাশের আরো কিছু বস্তু সূর্যকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে।

সৌর জগতের মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে আছে অসংখ্য গ্রহকণিকা। এরা সংখ্যায় হাজারে হাজারে লাখে লাখে। এই লাখো লাখো ক্ষুদ্রাকৃতি গ্রহকণিকাগুলোও ঝাঁক বেঁধে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।

হয়তো এই লাখো লাখো গ্রহণকণিকার মাঝখান থেকেই একটি মাঝারী সাইজের গ্রহকণিকা দৈবক্রমে কক্ষচ্যুত হয়ে এসে পড়েছিলো পৃথিবীর দিকে। তারপর একসময় ঢুকে পড়েছিলো পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতার মধ্যে। অবিকল উল্কার মতোই এই কক্ষচ্যুত গ্রহকণিকাটি ছুটে আসছিলো পৃথিবীর দিকে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে বাতাসের সাথে সংঘর্ষে জ্বলে উঠেছিলো এর সর্বাঙ্গ।

তারপর অবিশ্বাস্য গতিতে রকেটের মতো ছুটে এসে আছড়ে পড়েছিলো এই হতভাগ্য ভূ-খণ্ডটির ওপর। মোখ সাহেবের অনুমান, ছুটে আসা এই গ্রহকণিকাটির ব্যাস ছিলো প্রায় সাড়ে নয় কিলো-মিটারের (ছয় মাইল) মতো। মহাকাশের এই দৈত্যটির পতনের সময় সে যে সত্যি সত্যি কি ভয়ংকর দৃশ্যের অবতরণা হয়েছিলো তার বর্ণনা দেয়াও কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

সেই শেষ মহাপ্রলয়ের একটা খণ্ড প্রলয়কাণ্ড কয়েক হাজার বছর আগেই ঘটে গিয়েছিলো বাস্তব পৃথিবীর বুকে।

যদিও সেই মহাপ্রলয়ের প্রত্যক্ষদর্শীর কোনো বর্ণনা নেই। থাকা সম্ভবও ছিলো না। যারা সেই মহা ভয়ংকর দৃশ্য আপন সৌভাগ্য (?) অর্জন করেছিলো তারাও সেই আহামরি নয়নে দর্শন দৃশ্যটি দুচার মিনিটের বেশী সময় দেখতে পারেনি। তারপর নিজেরাই সেই মহাপ্রলয়ের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলো।

মহাকাশের সেই ভয়ংকর দৈত্যটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার পরই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলো। পৃথিবীর তিনশো কিলোমিটার (আড়াই'শ মাইল) ওপরে থাকতেই তার শরীর থেকে বের হতে শুরু করেছিলো লাল রঙের জ্বলন্ত হাইড্রোজেন গ্যাস। এই জ্বলন্ত গ্যাস অবিকল ধূমকেতুর লেজের মতো হয়েছিলো তার পেছনে। গ্যাসের লেজ দৈর্ঘ্য ছিলো প্রায় ৪০/৪৮ কিলোমিটারের (২৫/৩০ মাইল) মতো।

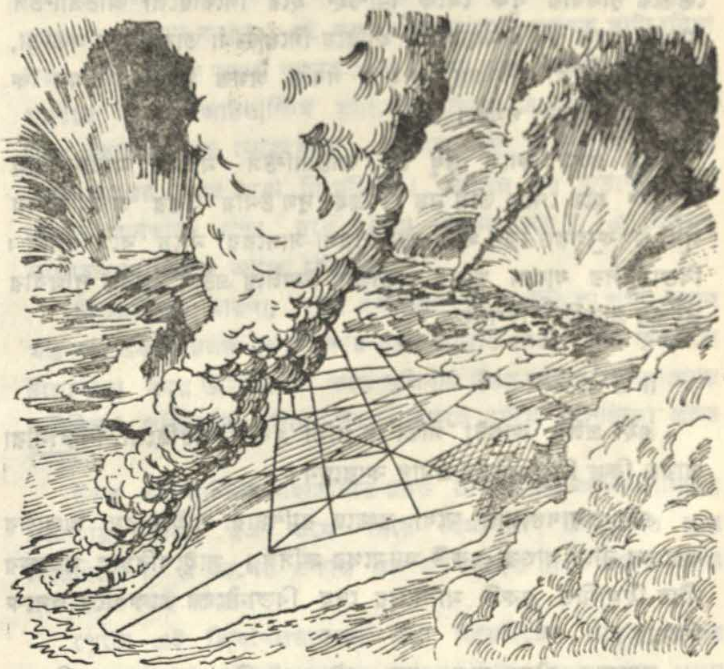
এই অভূতপূর্ব ভয়ংকর দৃশ্যটি বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি। মাত্র দু'চার মিনিটের মধ্যে এই জ্বলন্ত দৈত্যটি প্রচণ্ডতম বেগে এসে নেমে পড়েছিলো পৃথিবীর বুকে। এর ওজন ছিলো কয়েক শত কোটি টন।

বায়ুর সাথে প্রচণ্ড সংঘর্ষে এর শরীর থেকে ছিটকে পড়ছিলো অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন,—গ্রহকণিকাটির শরীর থেকে ছিটকে পড়া কণিকাগুলোর আঘাতেই সৃষ্টি হয়েছিলো কয়েক হাজার ক্ষত চিহ্নের। আর মূল বৃহৎ খণ্ডটির আঘাতে জন্ম হয়েছিলো পূর্টোরিকা গহ্বরের।

শুধু এই গ্রহকণিকাটির গায়ের আগুনই নয়, ভূ-পৃষ্ঠেও সেই সময় সৃষ্টি হয়েছিলো তার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া। এই মহাদৈত্যটির পতনের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে লেগেছিলো প্রচণ্ড চাপ। এর ফলে মহাদেশ এবং তার আশে পাশের সাগরের তলদেশে যে সমস্ত আগ্নেয়গিরি ছিলো যেমন,—মৃত আগ্নেয়গিরি, সুপ্ত আগ্নেয়গিরি, সক্রিয় আগ্নেয়-গিরি অথবা যেটা এখনো অগ্ন্যুৎপাত ঘটানো শুরু করেনি, সবেমাত্র বুকের ভেতর লাভা জমাতে শুরু করেছে—এর সবগুলোতেই ঘটেছিলো একসঙ্গে বিস্ফোরণ। এই অঞ্চলে শত শত আগ্নেয়গিরি থেকে শুরু হয়েছিলো প্রচণ্ড বেগে অগ্ন্যুৎপাত।

ইটালীর মাত্র একটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে লাভার নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিলো পম্পেই এবং হারকুলেনিয়াম নামে আস্ত দুই দুটো শহর। আর এখানে শত শত আগ্নেয়গিরি যদি একসাথে



আটলান্টিসের বুকে ঘটে যাওয়া মহাপ্রলয়ের শেষ মুহূর্তের দৃশ্য

অগ্ন্যুৎপাত শুরু করে তা হলে কি যে ভয়ংকর কাণ্ডকারখানা হবে তা কল্পনাই করা যায় না।

এই লাভা ছিলো ভয়ানক রকমের উত্তপ্ত এবং গলিত। গলিত লোহার মতো টকটকে লাল। সেই সাথে শুরু হয়েছিলো প্রচণ্ড জলোচ্ছাস। ফুটন্ত জলরাশি কয়েক শো মিটার উঁচু হয়ে এসে ছিটকে পড়তে শুরু করছিলো। শুরু হয়েছিলো প্রবল ঘূর্ণিঝড়। ঘটেছিলো বাতাসে ভয়াবহ রকমের নিম্নচাপ। সেই সাথে শুরু হয়েছিলো প্রচণ্ড ভূমিকম্প। সারা পৃথিবীটা যেনো কেঁপে উঠেছিলো থরথর করে। বলতে গেলে যত রকমের প্রাকৃতিক প্রলয় কাণ্ডে হতে পারে তার সবগুলোই ঘটে গিয়েছিলো শুধু মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে।

আর এই আবিশ্বাস্য রকমের প্রলয় কাণ্ডে মাত্র চব্বিশ ঘন্টার ভেতরে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো আটলান্টিস নামের আস্ত একটি মহাদেশ। হারিয়ে গিয়েছিলো তার সকল সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জীবজন্তু, পাহাড় পর্বত সমস্ত কিছু। এমন কি তার নাম নিশানা পর্যন্ত।

এই প্রলয় কাণ্ডে শুধু যে আটলান্টিস নামের মহাদেশটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাই নয়। এই দুর্ঘটনায় উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলেরও বেশ খানিকটা জায়গা সাগরের নীচে বসে গেছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা মানব সভ্যতার উষালগ্নে এটাই সম্ভবত পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

॥ ৫ ॥

এই প্রলয় কাণ্ডটা সত্যি যে সত্যি একদা ঘটেছিলো, বিজ্ঞানীরা তারও কিছু কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ করেছেন।

এই প্রমাণগুলোর মধ্যে রয়েছে রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলের বরফের নীচে পাওয়া একটি ম্যামথের ফসিল। সাইবেরিয়ার বরফের নীচে হিমায়িত একটি ম্যামথের দেহ বিজ্ঞানীদের একেবারে চমকে দিয়েছে।

বরফের নীচে চাপা পড়া এই ম্যামথটির শুধু হাড়হাড্ডি নয়, তার আস্ত শরীরটাই প্রায় অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এমনকি

তার গায়ের মাংস পর্যন্তও টাটকা আছে। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হলো ম্যামথটি বরফের নীচে ঢাকা পরার আগে মুহূর্তে যে খাদ্য গ্রহণ করেছিলো সেই বৃক্ষের পাতা, ঘাস পর্যন্ত অক্ষুন্ন আছে। এখনো হজম হয় নি। এই হাজার হাজার বছর পরেও ম্যামথের পেটের ভেতরে তেমনি আছে।

কিন্তু বিজ্ঞানীদের বিস্ময়ের ব্যাপার হলো—এই অক্ষত হিমায়িত ম্যামথের পেটে যে লতা পাতা ঘাস বিচালি পাওয়া গেছে, এগুলো এই সাইবেরিয়া অঞ্চলের কোথাও জন্মায় না। এমনকি প্রাগৈতিহাসিক যুগেও কখনো জন্মাতো না। তাহলে ম্যামথটা এগুলো পেলো কোথা থেকে ?

এই প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব বিজ্ঞানীরা আজো দিতে পারেন নি। অনেকে অনুমান করেন, এই ম্যামথটির বাসস্থান সম্ভবত সাইবেরিয়া নয়। এটা এসেছে আরো বহুদূর থেকে। হতে পারে হয়তো এককালের হারিয়ে যাওয়া আটলান্টিস মহাদেশেই ছিলো এদের বিচরণভূমি। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন থেকে যায়। তাহলে এই ম্যামথটাও নিশ্চয়ই প্রলয় কাণ্ডের সময় মারা গিয়েছিলো। তাহলে এর মৃতদেহ এমন অক্ষত অবস্থায় এতো দূরে এলো কেমন করে ? এ প্রশ্নেরও সন্তোষজনক জবাব আজো মেলেনি।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, যখন এই প্রলয়কাণ্ড ঘটেছিলো তখন অমন মস্ত বড় একটা জ্বলন্ত গ্রহকণিকার প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে গোটা পৃথিবীটা টলোমলো করে উঠেছিলো। ফলে পৃথিবীর উত্তর মেরুর আবহাওয়ায় ঘটেছিলো পরিবর্তন। সারা উত্তর অঞ্চলে নেমে এসেছিলো প্রচণ্ড শৈত্য।

উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কয়েক কিলোমিটার এলাকার কাদা জল জমে গিয়ে হিমশৈলে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলো। এ ধরণের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের চাকা অনেক সৃষ্টি হয়েছিলো সেই সময়।

প্লেটো এই হিমশৈলগুলোরই নাম দিয়েছিলেন কাদার সাগর (Sea of mud)। এই কাদার সাগরগুলোর জন্য এক সময় জিব্রাল্টার প্রণালীর মধ্য দিয়ে নৌ-চলাচল পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। এই অবস্থা ছিলো দীর্ঘকাল।

বিজ্ঞানীদের ধারণা—এই ধরনের হিমশৈলের ভেতরেই ছিলো এই ম্যামথের দেহটি। আর জিব্রাল্টার প্রণালীর মধ্য দিয়ে ভূ-মধ্য-সাগরে ভাসতে ভাসতে এটি শত শত বছরে চলে এসেছিলো আরো পূর্ব দিকে। মৃত ম্যামথের এতোদূর পথ চলে আসার হয়তো এটাই মূল রহস্য।

এই ধরনের কাদার চাকা যে এই অঞ্চলে আরো এসেছিলো। তারও প্রমাণ কিছু আছে। যেমন—গত ১৯২২ সালে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার সি, লিউনার্ড ওলী (Sir. C. Leonard Woolley) তুরস্কের সুমেরিয়া (Sumeria) অঞ্চলের প্রাচীন ওর (Ur.) নগরী খনন করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, এই প্রাচীন ওর নগরীটি পয়গম্বর হযরত ইবরাহিমের (আঃ) জন্ম স্থান। ওলী সাহেবই এই ওর নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন।

এই নগরী খননের সময় ওলী সাহেব একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করেন। তিনি ভূ-গর্ভে খনন করতে করতে একটি মাটির স্তর আবিষ্কার করেন। তিনি শহরের মাটি খনন করছিলেন, প্রতি মুহূর্তে মাটির তলা থেকে বের হচ্ছিলো নানা ধরনের জিনিসপত্র। ইট মাটির তৈরি বিভিন্ন জিনিসের ভাঙা অংশ। মোট কথা প্রতি স্তরেই একটা না একটা কিছু ছিলো। কিন্তু খনন করতে করতেই তিনি এমন একটা স্তর আবিষ্কার করলেন, যে স্তরটা ছিলো একেবারে নির্মল। প্রায় দশ পনেরো মিটার চওড়া, তেমনি পুরু এই স্তরে ভাঙা জিনিসপত্র থাকাতো দূরের কথা একটা কুটা পর্যন্ত ছিলো না। আরা এই স্তরের মাটির নমুনাও ছিলো ভিন্ন রকম। অর্থাৎ এটা হয়তে কোন ভিন্ন স্থানের মাটি, এখানে এসে চাপা পড়ে গেছে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়তো ওলী সাহেবের আবিষ্কৃত এই আশ্চর্য মাটির স্তরটি প্লেটোর কাদার সাগরেরই অংশবিশেষ। এই চাকাগুলোই ভাসতে ভাসতে এখানে এসে মাটি চাপা পড়েছিলো।

আটলান্টিসের বুকে এই প্রলয় কাণ্ড ঘটে যাওয়ার কয়েক হাজার বছর পর্যন্তও সারা ইউরোপে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা

গিয়েছিলো। যেমন—আটলান্টিসের ধ্বংসলীলার তিন হাজার বছর পর্যন্ত ইউরোপের আকাশে আগ্নেয়গিরির কালো ধোঁয়ার মতো এক ধরণের ধোঁয়া ভেসে বেড়াতো।

এই ধোঁয়াগুলো ছিলো খুব বিষাক্ত। শত শত কিলোমিটার জুড়ে ছিলো এই কালো ধোঁয়ার স্তর। এর নীচে যারা বাস করতো তারা এর প্রতিক্রিয়ায় হতো স্বল্পায়ু। আর এই খানে প্রায় সব সময়ই একটা না একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় লেগেই থাকতো। হয়তো প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সবকিছু জমে বরফ হতো, নয়তো শুরু হলো ঘন ঘন ঝড়-বৃষ্টি বন্যা, আর না হয় প্রচণ্ড খরা। কোনটা যে কখন আসে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

উপরের এই ধোঁয়ার স্তর ভেদ করে সূর্যের আলোও এসে ভালো-ভাবে মাটিতে পড়তে পারতো না। নীচে থেকে আকাশটাকে দেখলে ধূসর কালো দেখাতো। সূর্যকে দেখা যেতো লাল গোলকের মতো। ঠিক আমাদের সন্ধ্যে কিংবা সকালের সূর্য যেমন ঠিক তেমনি। এই কালো ধোঁয়া মিলিয়ে যেতে সময় লেগেছে হাজার হাজার বছর।

শেষ কথা হলো, এই হারিয়ে যাওয়া আটলান্টিসের ধ্বংসলীলার আরো প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাইতে হলে মানুষকে আরো অনুসন্ধান চালাতে হবে। যেখানে সেই মহাকাশের বিশাল দৈত্যটি পড়েছিলো নিশ্চয়ই এখনো তার অবশিষ্ট বিদ্যমান আছে।

কিন্তু অত সাগরের তলদেশে তার সন্ধান করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তার জন্য মানুষকে আরো প্রযুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী হতে হবে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মহাকাশের সেই দৈত্যের অনুসন্ধান করার জন্য মানুষকে কমপক্ষে কয়েক হাজার বছর অপেক্ষা করতে হবে। তিরিশ হাজার ফুট জলের তলে আরো কয়েক হাজার ফুট মাটির নীচে খনন কার্য চালানো আজো মানুষের সাধ্যের বাইরে।

॥ ৬ ॥

এই আটলান্টিস মহাদেশটির মতোই আরো একটি মহাদেশ ছিলো। এর অবস্থান ছিলো প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায় মাঝখানে। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশটির উত্তর-পূর্ব উপকূল ঘেঁষে। আটলান্টিসের

মতোই এর নামকরণও করা হয়েছিলো সাগরের নামের সাথে মিল রেখেই। প্রশান্ত মহাসাগর বা প্যাসিফিক ওসানের নামেই এর নাম রাখা হয়েছিলো 'প্যাসিফিকা'।

এরও আজ আর কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে এই পাসিফিকার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পেছনে আটলান্টিসের মতো অমন কোনো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা নেই। এই প্যাসিফিকা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে একান্তই প্রাকৃতিক নিয়মে একেবারে সবার অলক্ষ্যে। ধীরে ধীরে। কোটি কোটি বছরের ক্রম পরিবর্তনের মাধ্যমে।

আমেরিকার ক্যালিফোনিয়ার স্টার্ণ ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর এ্যামস্ নূর এবং ইসরাইলের ওয়াইজম্যান ইনস্টি-টিউটের ডক্টর বিবেন আব্রাহাম দীর্ঘদিন ধরে প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের পর্বত শ্রেণীর জন্ম প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তাঁরাই সম্প্রতি বলেছেন,—আজ থেকে বাইশ কোটি বছর আগে প্রশান্ত সহাসাগরের মাঝামাঝিস্থানে প্যাসিফিকা নামে একটি বিশাল ভূ-খণ্ড বিদ্যমান ছিলো।

কিন্তু চিরদিন থাকলোনা। একসময় এই বিশাল ভূ-খণ্ডটি চারখণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেলো। তারপর এক একখণ্ড ভেসে চললো এক একদিকে। ভূ-পৃষ্টের অন্যান্য ভূ-খণ্ড গুলো যেমন করে ক্রমাগত সরে যাচ্ছে একএক দিকে, তেমনি খণ্ডিত অংশগুলোও চলতে শুরু করলো আপন পথে।

তারপর একসময় একখণ্ড ভাসতে ভাসতে মিশে গেলো এশিয়ার পূর্ব উপকূলের সাথে। অপরখণ্ড মিশেগেলো দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে। বাকী দুটো খণ্ড মিশে যায় উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের সাথে।

ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেন,—আলাস্কা, পূর্ব সাইবেরিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার যেখানে এই মহাদেশের বিশাল বিশাল খণ্ডের সংঘর্ষ হয়েছে সেখানেই গড়ে উঠেছে পর্বত মালা।

তবে প্যাসিফিকার অপর একটি বিশাল খণ্ড এখনো সমুদ্রের তলদেশেই রয়েছে। যেখানে একদা এই মহাদেশটির অবস্থান ছিলো এই ডুবন্ত খণ্ডটি এখনো সেখানেই আছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন,—প্যাসিফিকার এই পরিত্যক্ত ডুবন্ত খণ্ডটির অবস্থান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের ডুবন্ত উচ্চ ভূমিগুলোর উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানা যাবে।

এই মহাদেশটির অস্তিত্ব সম্পর্কে সঠিক জানা গেলে আরো কিছু চমৎকার তথ্যও জানা যাবে। বর্তমানে মহাদেশগুলো পরস্পর থেকে বহুদূরে অবস্থান করছে, কিন্তু তা সত্বেও এদের মধ্যে অনেক কিছু মিল আছে। যেমন—প্রশান্ত মহাসাগরের চারপাশের ভূ-খণ্ডগুলোর অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়। এই মিলগুলো এলো কেমন করে? এদের কারো সাথে তো কারো কোনো যোগাযোগ নেই।

তাই বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন—একটি মূল ভূ-খণ্ড টুকরো টুকরো হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ার ফলেই এই সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। একই মূল ভূ-খণ্ডের প্রাণী আর উদ্ভিদ খণ্ডিত ভূ-খণ্ডের সাথে চলে গেছে অন্য ভূ-খণ্ডে। তাই সাদৃশ্যের মূলেও রয়েছে হারিয়ে যাওয়া প্যাসিফিকা মহাদেশটি।

বাইশ থেকে তেইশ কোটি বছর আগে বিদ্যমান ছিলো এই মহাদেশটি। তারপর শুরু হয় এর ভাঙন। এবং বিশ কোটি বছর আগে এর খণ্ডিত অংশগুলো রওনা দিয়ে দীর্ঘ তেরো কোটি বছর ধরে পথ চলে মাত্র ছয় কোটি বছর আগে পৌঁছে যায় যার যার স্থানে। আর যেখানে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জেগে ছিলো একটি বিশাল মহাদেশ সেখানে খেলে বেড়াতে লাগলো উথাল পাথাল ঢেউ।

জানুয়ারী, ৯৮৩

মাটির পৃথিবীর সংগীতচর্চা

খুব একটা বেশী দিনের কথা নয়। ঘটনাটি ঘটেছিলো ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসের ২৭ তারিখে শুক্রবারে। জনবিরল দেশ আলস্কার একটি পার্বত্য উপত্যকায় ঘটেছিলো এই ঘটনাটি। সহসা একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি থেকে শুরু হয়েছিলো অগ্ন্যুৎপাত। প্রচণ্ড কাঁপুনি। কাঁপুনিতে কয়েক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে শিলা পাথর ওলট পালট হয়ে একেবারে ঢুকে গিয়েছিলো ভূ-গর্ভে। কিন্তু সবচেয়ে পিলে চমকানো ঘটনাটা ঘটেছিলো ঐ শুক্রবারেই বিকেল পাঁচটা ৩৬ মিনিটের সময়। এই সময় একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে ভূ-গর্ভে। এর শক্তি এতো ছিলো যে, বিজ্ঞানীরা বলেন,—প্রায় শ'খানেক হাইড্রোজেন বোমা একত্র ফাটালে যে শক্তির সৃষ্টি হয় এই বিস্ফোরণটিরও তেমনি শক্তি ছিলো। এই বিস্ফোরণে প্রায় গোটা আলস্কা দেশটাই কেঁপে উঠেছিলো। এমন যে জনবিরল দেশ সেই দেশেরও প্রায় ১১৫ জন লোক মারা পড়েছিলো এই বিস্ফোরণে।

ভূমিকম্প তো প্রায়ই হয়। প্রায় প্রতি দিনই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও ভূমিকম্প হচ্ছেই। এর মধ্যে পৃথিবী কাঁপানো ভূমিকম্পও হয় মাঝে মাঝে। আলাস্কার এই ভূমিকম্পটি ও ছিলো সেই দুনিয়া কাঁপানো ভূমিকম্পগুলোরই একটি।

কিন্তু অন্যান্য সময়ের ভূমিকম্পের সাথে আলাস্কার এই ভূমিকম্পটির একটা পার্থক্যও ছিলো। আসলে ওটাই হলো মজার ব্যাপার।

কোথাও ভূমিকম্প হলেই আধুনিক কালের বিজ্ঞানীরা শক্তিশালী বিশেষ ধরনের ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের সাহায্যে তার পরিমাণ মেপে দেখেন। এই শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্যে ভূ-ত্বক থেকে শুরু করে এবং প্রায় সাড়ে ছয় হাজার কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত কম্পন মাপা যায়। একেবারে পৃথিবীর ভূ-গভের কেন্দ্র বিন্দু পর্যন্ত

কোথায় কতটুকু কাঁপন লেগেছে, কতটুকু শিলাচ্যুতি ঘটেছে, তার পরিমাণ কতো, তা প্রায় নিখুঁত ভাবে ধরা পড়ে এই যন্ত্রে। ভূ-বিজ্ঞানীরা প্রতিটি ভূমিকম্পরই কম্পনের পরিমাণ, শিলাচ্যুতির বা অন্যান্য প্রতিক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন চার্ট করে রাখেন। চার্ট করা হয়েছিলো ১৯৬৪ সালের আলাস্কার এই ভূ-কম্পনটিরও। কিন্তু আগের রাখা চার্টের সাথে ১৯৬৪ সালের আলাস্কা ভুমিকম্পের চার্ট মিলাতে গিয়েই বিজ্ঞানীরা উঠলেন চমকে। কারণ এই সর্বশেষ পরীক্ষায় এমন কতোগুলো বিশেষ বিশেষত্ব ধরা পড়েছিলো যা আগে আর কখনো জানা যায়নি। পৃথিবী সম্পর্কে অনেক অজানা রহস্যের কথা জানতে পারলেন বিজ্ঞানীরা এই প্রথম। এই অজানা কথাগুলো যেমন রহস্যময় তেমনি চমকপ্রদও। পৃথিবীর গঠন প্রকৃতি ও এর জন্ম রহস্য সম্পর্কেও অনেক অজানা কথা জানা গেলো এই প্রথম।

বিজ্ঞানীরা ১৯৬৪ সালের সিসমোগ্রাফে ধরা পড়া সংকেত থেকে এই প্রথম জানতে পারলেন যে, পৃথিবীর তলদেশে সর্বক্ষণই—বিশেষ করেন ভূমিকম্পের সময় এক ধরনের আওয়াজ হয়। এই আওয়াজটা অনেকটা ঘন্টা ধ্বনির মতো টুংটাং আওয়াজ। অথবা কোনো শিল্পী যখন খুব ধীর লয়ে গীটারের তারের উপর আঙুল চালনা করে তখন যে মিষ্টি আওয়াজ হয়, পৃথিবীর গভীর তলদেশেও তেমনি বাজে বাজনা।

পৃথিবীর একেবারে গভীর তলদেশ আছে ঘন্টার জিহবার মতো শিলাখণ্ড। এই শিলাখণ্ডের পরিমাণ কোটি কোটি টন। এই শিলা খণ্ড গুলোই একটার সাথে অন্যটির ঘর্ষণ লেগে শব্দ হয়। যখন পৃথিবীর কোনো স্থানে ভূমিকম্প হয়, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে ঝাঁকুনি লাগে, তখনই শিলাখণ্ডের ঘর্ষণে সৃষ্ট হয় এই আওয়াজের। যদিও এই আওয়াজ স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের কানে বাজেনা, কিন্তু তা সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে ধরা পড়ে।

এটা হয় এভাবে যখন আমরা কথা বলি, তখন আমাদের মুখ থেকে নিঃসৃত শব্দ ইথারে একটি শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করে এবং তা মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। জলে ঢেউ দিলে যেমন

করে তা গোলাকার তরঙ্গ সৃষ্টি করে ছড়িয়ে যায় চারপাশে। এও অনেকটা তেমনি।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে করে কেমন এই শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, বিজ্ঞানীরা এরও কিছু কিছু কারণ অনুসন্ধান করে দেখেছেন।

পৃথিবীতো দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু এই প্রদক্ষিণ করতে করতে সে আবার আপন অক্ষের উপরেও পাক খায়, পাক খায় লাটাইয়ের মতো। আর এজন্যই হয় দিন রাত্রি। কিন্তু এই দুটো কাজ ছাড়াও পৃথিবী আরো একটি কাজ করে। এই ঘুরতে ঘুরতেই পৃথিবী উপরে নীচেও উঠা নামা করে। অর্থাৎ পৃথিবী লাটাইয়ের মতো ঘুরতে ঘুরতেই উপরে নীচেও দোলে।

যদিও এই দোলনের পরিমাণ একেবারেই সামান্য। পৃথিবী উপরে নীচে (Up and down) মাত্রই ২৫·৪ মিলিমিটার (এক ইঞ্চি) পরিমাণ দোলে। যদিও এটা খুবই সামান্য, কিন্তু এই দোলনের জন্যই এর ভিতরে সৃষ্টি হয় কাঁপন। আর এই কাঁপনই জন্ম দেয় শব্দ তরঙ্গের।

বিজ্ঞানীরা মাত্র অল্প কিছুদিন আগে এই সূত্রটি আবিষ্কার করেছেন। অতি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত এই সূত্রের নাম দেয়া হয়েছে পৃথিবীর মুক্ত দোলন গবেষণা (Earth's Free Oscillations Research)

সূত্রটি অল্প দিনের অবিষ্কৃত হলেও এর একটা অতীত ইতিহাস আছে। এর সাথে জড়িয়ে আছে অনেক প্রাচীন বিজ্ঞানীর নাম। যেমন ১৮৮০ সালে মিঃ এ, ই, এইচ, লাভ (Mr. A, E, H, Love) নামে বৃটেনের একজন অংক শাস্ত্রবিদ প্রথম এ সম্পর্কে গবেষণায় হাত দেন।

তিনি তাঁর অঙ্ক শাস্ত্র দিয়ে ভূমিকম্পের কারণের এবং প্রতিক্রিয়ার উপর গবেষণা চালান। তিনি বলেন,—পৃথিবীর কোনো স্থানে যখন বড় রকমের কোনো ভূকম্পন হয়, সেটা যে শুধু ওই অন্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। এর কম্পন ছড়িয়ে পড়ে গোটা পৃথিবীতে। ভূ-গর্ভের সমস্তটাতেই তার কাঁপুনি লাগে।

এটা হয় এভাবে, যেমন কেউ যদি কোন গীটার, সেতার বা দোতারার কোনো একটি মাত্র তারে আঙ্গুল দিয়ে টোকা মারে তখন ওটা থেকে মিষ্টি আওয়াজ হয়। টোকা মারার সাথে সাথেই তারটি উপরে নীচে দোলে, কেঁপে ওঠে, আর তখনই সৃষ্টি হয় শব্দের। এখানে আরও একটা কথা হলো, তারে টোকা দিলে যে শুধু তারের ওই অংশটুকুতেই কম্পন সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়, গোটা তারটির সমস্তটাতেই এই কম্পন অনুভূত হয়। পৃথিবীর বেলাতেও এটাই ঘটে।

লাভ সাহেবের সূত্র থেকেই বলা যায়, পৃথিবীর কোনো অংশে যখন কোন ভুমিকম্প হয় এবং এই প্রচণ্ড ভুমিকম্পের ফলে যখন শিলাচ্যুতি ঘটে, তখনই শুরু হয় তরঙ্গের। শান্ত দীঘিতে ঢিল মারলে যেমন ঢেউয়ের রেখা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এই ভূ-কম্পনের ফলেও তেমনি হয়। এই কম্পন অবিকল জলের ঢেউয়ের মতই চারদিকে ছড়ায়। শুধু চার দিক নয়। এটা ছড়ায় ডাইনে, বায়ে, উপরে, নীচে একেবারে চতুর্দিকে। কম্পনের কেন্দ্র বিন্দু থেকে হয় শুরু, ছড়িয়ে যায় সমস্ত পাতালপুরী।

এই কম্পন তরঙ্গের মাত্রা বা পরিমাণ নির্ভর করে যেখানে এর কেন্দ্র বিন্দু সেখানকার শিলাস্তরের গুণগতমানের উপর।

যেমন—একটি গীটারের সবগুলো তারেই কিন্তু একই ধরনের আওয়াজ হয় না। কোনো তারে টোকা দিলে আওয়াজ হয় মোটা, কোনোটায় বা মিষ্টি মিহি আওয়াজ। এটা হয় তারের গুণগতমানের উপর নির্ভর করে। কোন তার কতো মোটা, কোন তার কতো সরু, কোনটা কোন ধাতু দিয়ে গড়া, এসবের উপর নির্ভর করেই আওয়াজের হেরফের হয়।

পৃথিবীর ভূ-গর্ভের কম্পনের পরিমাণও নির্ভর করে শিলার মানের উপর। যেমন—যেখানে কম্পনের কেন্দ্র বিন্দু হবে, সেখানকার শিলা যতো ঘন ও কঠিন হবে, কম্পন ততো তীব্র আর দ্রুত হবে।

এই কম্পন কতো দ্রুত বেগে ছড়িয়ে পড়তে পারে? এটাও নির্ভর করে শিলার কঠিনতার উপর। তবে সাধারণভাবে বলা যায় এই ভূ-গর্ভের কম্পন তরঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার গতিবেগ

হলো প্রতি তিন মিনিটে এক হাজার মাইল (এক হাজার ছয়শো দশ কিলো মিটার)। এটাই ছিলো লাভ সাহেবের সূত্রের মূল কথা।

কিন্তু এই সূত্র তিনি দীর্ঘদিন আগে দিয়ে গেলেও এর তেমন প্রচার বা প্রসার কিছু হয়নি। এটা প্রায় অজানাই ছিলো মানুষের কাছে। এমন কি বিজ্ঞানীদের কাছেও।

এরপর কেটে গেছে অনেক দিন। বহু যুগ পরে এই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ডঃ হুগো বেনিয়ফ (Dr. Hugo Benioff) সাহেব এক নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। ডঃ হুগো বেনিয়ফ ছিলেন আমেরিকার ক্যালিফোনিয়ার ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির প্রফেসর। বেনিয়ফ সাহেব যে যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন সেটি দিয়ে ভূ-গর্ভের একেবারে সামান্যতম স্পন্দনও ধরা যায়।

১৯৫২ সালের ৪ঠা নবেম্বর তারিখে পূর্ব সাইবেরিয়ার পেনিনসুলাতে একটি বড় ধরণের ভূমিকম্প হয়। এই ভূ-কম্পনের তরঙ্গের মাপ বা শক্তি ধরার জন্য ভূ-গর্ভে পাতা হয়েছিলো ডঃ বেনিয়ফ সাহেবের যন্ত্রটি। এতে ধরা পড়ে ভূ-গর্ভে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে তা এমাথা থেকে অন্য মাথায় পৌঁছতে সময় লাগে মোট ৫৭ মিনিট। এই শব্দটি প্রতিবারেই হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে এবং নিয়মিত। এইসূত্র থেকে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে এটা ভূ-গর্ভেরই প্রচলিত কম্পন। এটা ভূমিকম্পের আকস্মিক ফল নয়। এটা পৃথিবীর মুক্ত দোলনের প্রতিক্রিয়া।

এই সূত্র ধরেই ইসরাইলের ওয়াইজম্যান ইনস্টিটিউটের ভূ-তত্ত্ববিদ ও অঙ্ক শাস্ত্রবিদ ডঃ চেইম এল পেকারিজ (Dr Chaim L. Pekeris) ১৯৫৯ সালে ভূ-গর্ভে স্থাপন করেন একটি কম্পিউটার। এই যন্ত্রে পৃথিবীর ভূ-গর্ভের কম্পনের কতগুলো মূল সংখ্যা ধরা পড়ে। এবং এর সাহায্যেই বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর এই অদ্ভুত শব্দকরণের কারণ সম্পর্কে গবেষণা করতে পারেন। ডঃ পেকারিজ 'মেলডীস' (Melldies) নামে এই তত্ত্বের উপর একটি গ্রন্থও রচনা করেন।

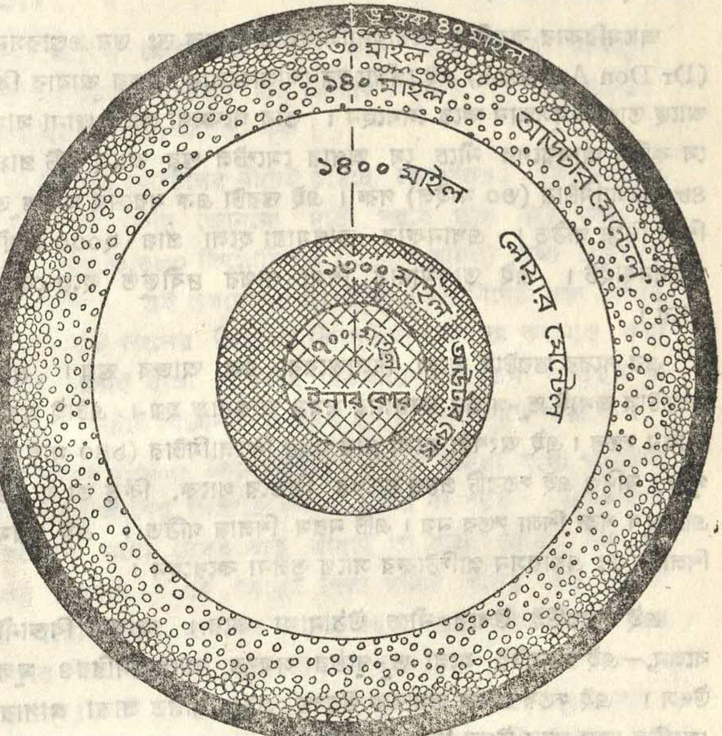
এরপর এই গবেষনার ক্ষেত্রে আরো একধাপ উন্নতি লাভ হয়। ১৯৬০ সালের আরো বড় একটি ভূমিকম্পের ঘটনা থেকে। দক্ষিণ

আমেরিকার চিলির পর্বতসংকুল ও সমুদ্র উপকূলে একটি বড় রকমের ভূমিকম্প হয় ১৯৬০ সালের ২১শে মে তারিখে।

এই ভূমিকম্পে প্রায় কয়েক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ধ্বংসলীলা সংগঠিত হয়। এই ভূমিকম্পের পূর্বাভাস পেয়ে বিজ্ঞানীরা আগে থেকেই তৈরি ছিলেন।

ডঃ বেনিয়ফের যন্ত্রসহ পাতা হয়েছিলো অনেকগুলো আধুনিক সিস্মোগ্রাফ যন্ত্র। এই যন্ত্রগুলো দ্বারা বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর এই কম্পন আওয়াজকে ধরতে পারেন সুক্ষ্মভাবে। এবং এই গবেষণা থেকেই পৃথিবীর উপরে নীচে ডাইনে বাঁয়ের দোলনকেও তাঁরা ধরতে পারেন।

এই দোলন এবং দোলনের শব্দ তরঙ্গের গতি থেকেই বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও একটা সবিক ধারণা লাভ করবেন।



পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের স্তরবিন্যাস

ভূ-গর্ভের স্তর সম্পর্কে আমাদের পূর্ব থেকেই একটি প্রচলিত ধারনা আছে। ভূগর্ভে আছে অনেকগুলো স্তর। পৃথিবীটা অবিকল যেন একটি বড় পেঁয়াজ। একটি পেঁয়াজ যেমন একটির পর একটি খোসা দিয়ে তৈরি এই পৃথিবীটাও ঠিক তেমনি।

এর প্রথম স্তরটিকে বলে ভূ-ত্বক, এটা হলো গড়ে ৪০ থেকে ৪৮ কিলোমিটার (২৫ থেকে ৪০ মাইল) পর্যন্ত পুরু। এই কঠিন আবরণটির উপরেই আছে আমাদের দৃশ্যমান গোটা পৃথিবীটা। নদী, সাগর, দেশ, মহাদেশ, পাহাড়, পর্বত ইত্যাদি। এই কঠিন স্তরের পরের স্তরগুলোর নাম হলো আপার মেন্টেল (Uqper (Mantle), লোয়ার মেন্টেল (Lower Mantle), আউটার কোর (Outer Core), ইনার কোর (Inner Core)।

আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ডন এণ্ডারসন (Dr Don Anderson) এই পেঁয়াজের খোসাগুলোর ভিতর আবার কি আছে তাও অনুসন্ধান করে দেখছেন। তাঁর গবেষণা থেকে জানা যায় যে কঠিন আবরণের নীচে যে অপার মেন্টেল স্তর আছে এটি প্রায় ৪৮ কিলোমিটার (৩০ মাইল) পরু। এই স্তরটা এক ধরনের ঘনীভূত শিলা দিয়ে গঠিত। এখানকার তাপমাত্রা হলো প্রায় ২০০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট। এই তাপমাত্রায় শিলা পাথর দ্রবীভূত হয়ে যেতে পারে।

এর পরের স্তরটাই হলো শিলাস্তরের এক আজব স্তর। এই স্তরটার জন্যই ভূ-গর্ভের কম্পনের সময় আওয়াজ হয়। এটাই মুক্ত দোলন স্তর। এই অংশটা হলো প্রায় ২২৫ কিলোমিটার (১৪০ মাইল) পুরু। যদিও এই স্তরটি প্রচণ্ড চাপের ভিতরে থাকে, কিন্তু তা হলেও এটি খুব শক্ত শিলা স্তর নয়। এটি নরম শিলায় গঠিত। এই নরম শিলাকে ডঃ এণ্ডারসন প্লাস্টিকের সাথে তুলনা করেছেন।

এই স্তরটিই উপরে নীচে উঠানামা করে। অনেক বিজ্ঞানী বলেন,—এই স্তরটিই হলো ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত আগ্নেয়গিরিরও মূল উৎস। এই স্তর থেকে ভয়ানক উত্তপ্ত এবং গলিত লাভা আপার মেন্টেল ভেদ করে উপর দিয়ে উঠে যায়। তারপর ভূ-ত্বকের কঠিন

শিলা ভেদ করতে পারলে তা ছিটকে বেরিয়ে পড়ে ভূ-পৃষ্ঠে। আমরা এটাকেই বলি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত।

এই প্লাস্টিক জোনের নীচের স্তরটিই আবার ভয়ানক কঠিন শিলায় গঠিত। এই স্তরের শিলার অণুগুলো (Atom) প্রচণ্ডতম চাপে এতো ঘন হয়ে এসেছে যে এতে শিলাস্তর ভয়ানক সংকুচিত হয়ে পড়েছে।

এর পরের ৩২২ কিলোমিটার (২০০ মাইল) পর্যন্ত শিলাও ক্রমেই ঘন হতে শুরু করেছে এবং ভূ-ত্বকের ৬৪৪ কিলোমিটার (৪০০ মাইল) নীচে শিলা গ্র্যানাইটের চেয়েও প্রায় দ্বিগুণ ঘন। এখানকারই ৫৯৫ কিলোমিটার (৩৭০ মাইল) পর্যন্ত হলো আপার মেন্টেলের সীমানা।

এই আপার মেন্টেলের নীচেই শুরু হলো আরো ঘনীভূত শিলাস্তর লোয়ার মেন্টেল। এই লোয়ার মেন্টেল হলো প্রায় ২,২৫৪ কিলোমিটার (১,৪০০ মাইল) পুরু।

এই লোয়ার মেন্টেলের নীচেই রয়েছে কোরস্তর। সিসমোলজী অনুসারে এই কোর জোনকে দুটো স্তরে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। এর ৩,৩৮০ কিলোমিটার (২,১০০ মাইল) হলো একবারে ভিতরের অংশ। এই তলদেশের অংশটুকু একটি নিরেট শক্ত বলের আকৃতি। এই অংশের শিলা যে কি পরিমাণ ঘন তা কল্পনাও করা যায় না। এটাই হলো পৃথিবীর একবারে গভীরতম অন্তঃস্থল বা কেন্দ্রবিন্দু। এটাই বিজ্ঞানীদের কাছে ইনার কোর নামে পরিচিত।

এর উপরে ২,০৮০ কিলোমিটার (১,৩০০ মাইল) হলো আউটার কোর। এই অংশের শিলা একেবারে গলিত বা তরল। এই গলিত শিলা স্তরের মধ্যে যেসব ধাতু রয়েছে তা হলো লোহা, নিকেল, সিলিকন ইত্যাদি। এই স্তরের শিলা গলিত হলেও কিন্তু দুধ বা জলের মতো অমন সাধারণ পাতলা নয়। এই গলিত অবস্থাতেও এখানকার শিলা গ্র্যানাইট থেকে তিনগুণ ঘন।

এখানে যে কী প্রচণ্ড চাপ রয়েছে তা শুনলেই মাথা ঘুরে যায়। এখানকার চাপের পরিমাণ হলো প্রতি বর্গফুটে দশকোটি পাউণ্ড। এই

প্রচণ্ড চাপে এটম পর্যন্ত ভেঙ্গে যায়। কোনো কোনো ভূ-তত্ত্ববিদ মনে করেন, এই গলিত কোরটি একটি ডায়নামো বিশেষ। এই স্বয়ংক্রিয় ডায়নামো থেকে অবিরত বিদ্যুৎ তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এই বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবেই পৃথিবী চুম্বকত্ব লাভ করেছে।

এই গলিত অংশের ভিতরে অর্থাৎ একেবারে কেন্দ্র বিন্দুতে যে নিরেট কঠিনতম অংশ রয়েছে, সেটিই হলো ইনার কোর। বলের আকৃতি এই অংশটি কি যে শক্ত আর নিরেট তার তুলনা মতো দেবার বস্তু আর কিছু নেই। এর তুলনা কল্পনা করে নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এই অংশটুকুর ধাতু যেমন নিরেট, তেমনি ভয়ানক ওজন বিশিষ্ট। এখানকার এক কিউবিক ফুট ধাতুর ওজন প্রায় আধাটন। এটাকে বিজ্ঞানীরা মহাকাশের লোহা ও নিকেল মিশ্রিত কঠিন ধাতুর তৈরি উল্কা খণ্ডের সাথে তুলনা করেছেন।

বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর ভিতরকার এই ধাতুর বৈশিষ্ট্য এবং মুক্ত দোলন নিয়ে আরো নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এভাবেও তাঁরা ভূ-পৃষ্টের ভূমিকম্প সৃষ্টির মূল উৎস ও কারণ জানার চেষ্টা করেছেন। যদি ভূমি কম্পের মূল উৎস ও কারণ জানা যায়, তাহলে পূর্বেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে তাকে দমন করাও যেতে পারে। অন্তত বড় একটি ভূমিকম্পের শক্তি কমিয়ে দিতে পারলেও তো অনেক রক্ষা।

ভূ-তত্ত্ববিদগণ পৃথিবীর শিলাস্তরের সঠিক গঠন বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং ভিতরের শিলাস্তরের ভূ-ত্বকের নীচে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাও দেখা হচ্ছে। এই গবেষণা করতে গিয়েই বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর পেটের তলার এই অদ্ভুত গুঞ্জন ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। মানুষ শুনতে পেয়েছে পৃথিবীর সঙ্গীতের সুর মূর্ছনা। তাই বলতে হয়, মানুষ একবার যখন শিলাময় পৃথিবীর মুখের ভাষা শুনতে পেয়েছে, শব্দের উচ্চারণও তা হলে ঠিকই বুঝতে পারবে আর সেদিনই উন্মোচিত হবে সকল রহস্যের। মানুষ পাবে একদিকে স্নেহময়ী, অপর দিকে রুদ্র পৃথিবীর রুদ্ররোষ থেকে আত্মরক্ষা করার পথ। আমরাও সেই সাফল্যের পথ চেয়ে বসে আছি।

মার্চ, ১৯৮১

পাতালপুরীর অদৃশ্য দানব

ভাবতে গেলে কাণ্ডটা ভারী অদ্ভুত বলে মনে হয়। নিত্যদিনের মতো সব কিছুই চলছে যথানিয়মে। বাইরে বাতাস বইছে। পাখি ডাকছে। লোকজন তাদের দিনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু কি হলো? একমুহূর্তে সব কিছু যেনো উলট পালট আর লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলো। গোটা পৃথিবীটাই যেনো থর থর করে কেঁপে উঠলো। ধ্বংস হয়ে গেল ঘর বাড়ী। উল্টে গেলো গাছপালা। আর মুহূর্তেই ভবলীলা সাঙ্গ হলো হাজার হাজার মানুষের। সে এক মস্ত বিভীষিকা।

কিন্তু পৃথিবীটা সহসা এমন করে কেঁপে উঠলো কেনো? আর কেনোই বা এমন ধ্বংসলীলা ঘটে গেলো? লোকে বলে—এরই নাম ভূমিকম্প অর্থাৎ মাটির কাঁপন। কিন্তু এই মাটির কাঁপন সহসাই অমন করে কেনো ঘটে? সত্যি সে এক বিচিত্র রহস্য।

সম্প্রতি এই মাটির কাঁপনের বিচিত্র রহস্যের কথা বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন। অবশ্য তাও বেশী দিনের কথা নয়।

অতীতকালে যখন মানুষ এই ভয়াবহ ধ্বংস যজ্ঞের আসল রহস্য জানতে পারেনি তখন মানুষের মনে ছিলো কতো ভয়, আর কতো কুসংস্কার। আর তাইতো এই ভূমিকম্পকে নিয়ে প্রচলিত ছিলো নানা দেশে হরেক রকম মজার মজার গল্প।

যেমন—সাইবেরিয়ার আদিবাসীরা মনে করতো 'কোসেই' নামক একটি কুকুর এই পৃথিবীকে পিঠে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে প্রচণ্ড শীতে বরফের তাল জমে যাচ্ছে। কুকুরটির গায়ের লোমে বরফ জমছে। তাই কুকুরটা গা ঝাড়া দিয়ে মাঝে মাঝে শরীর থেকে বরফের কণা ঝেড়ে ফেলছে। আর তখবই পৃথিবীটা কেঁপে উঠছে।

হিন্দুদের পুরাণ শাস্ত্রে আছে 'বাসুকি' নামে একটি প্রকাণ্ড হাজার মাথাওয়ালা সাপ পৃথিবীটাকে মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবীর মানুষেরা যখন পাপকাজ করে তখন বাসুকি নাগ বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ায়। আর তখনি গোটা পৃথিবী কেঁপে উঠে।

পৃথিবীতে জাপান দেশে সবচেয়ে বেশী ভূমিকম্প হয়। অতীতে

জাপানীদের ধারনা ছিলো—বিরাট একটি 'মাকড়সা' এই পৃথিবীটাকে পিঠে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রকাণ্ড বোঝাটা পিঠে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মাকড়সাটা মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে। তাই একটু নড়াচড়া করে। আর তক্ষুনি হয় ভূমিকম্প।

এতো গেলো প্রাচীন কালের কথা। এমনকি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের পণ্ডিতদের মনেও এই ভূমিকম্প সম্পর্কে নানা ধরনের আজগুবি বিশ্বাস ছিলো, যার সাথ বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই।

যেমন—অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়, এতে হাজার হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে। নষ্ট হয় বহু সম্পদ জনপদ। তখন লণ্ডনের বিশপ প্রচার করেন যে, এটি হলো পৃথিবীর মানুষের প্রতি পাপের পরিণতি সম্পর্কে ঈশ্বরের হুঁশিয়ারি। এটি পাপের শাস্তি।

গ্রীক দেশে প্রখ্যাত দুজন পণ্ডিত ছিলেন। এদের একজন হলেন দার্শনিক এরিষ্টটল এবং আরেকজন হলেন অঙ্কশাস্ত্রবিদ পিথেগোরাস। এরাও ভূমিকম্প সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেছেন।

এঁদের মধ্যে দার্শনিক এরিষ্টটলের মতবাদ কিছুটা বিজ্ঞান সম্মত। তিনি মনে করতেন, পৃথিবীর ভিতরে অনেক গরম বায়ু জমা হয়ে আছে, সেই গরম বায়ু মাঝে মাঝেই বেরিয়ে আসার জন্য ভূ-ত্বকে ধাক্কা মারে। আর তখনি মাটি কেঁপে ওঠে। মুহূর্তে ঘটে যায় ধ্বংসলীলা।

কিন্তু অঙ্ক শাস্ত্রবিদ পিথেগোরাস মনে করতেন—পরলোকে আস্ত একটা মৃতমানুষের দেশ আছে। পৃথিবীতে যেমন নানা মতবাদ নিয়ে মানুষে মানুষে কলহ হয়, যুদ্ধ বিগ্রহ হয়, মৃত মানুষের পরলোকেও তেমনি মত বিরোধ নিয়ে বিবাদ ঘটে। আর তখনি পৃথিবী কেঁপে ওঠে। শুরু হয় ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা।

কিন্তু আধুনিক কালের এই বিজ্ঞানের যুগে মানুষ আর সেই প্রাচীন গপ্পো বিশ্বাস করতে রাজি নয়। বিজ্ঞান মানুষকে অনেক অজানাকে জানার ক্ষমতা দান করেছে। অনেক রহস্য আজ মানুষের কাছে ধরা পড়েছে।

ভূমিকম্প কেনো হয়, আধুনিক কালের মানুষেরা তা জানতে পেরেছেন। শত শত বছরের গবেষণা আর চিন্তা-ভাবনার পর

বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন—কেনো আগ্নেয়গিরির জন্ম হয়? কেমন করে সৃষ্টির আদি থেকে ধীরে ধীরে গঠিত হয়েছে ভূ-পৃষ্ঠ।

পৃথিবীর জন্মের পর কোটি কোটি বছর পার হয়ে গেলেও আজো কিন্তু এর ভিতরটা ভয়ানক রকম গরম। সেই গরমে সবকিছুই রয়েছে তরল অবস্থায়। আর তা দিনরাত ফুঁসছে। এর ভিতরকার সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমূহের ক্রমাগত ঘর্ষনের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে প্রচণ্ড তাপ।

এর ফলেই অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও ভারী জিনিস নীচের দিকে নামছে আর প্রচণ্ড গরম আর হালকা জিনিস উপরে ওঠে আসছে। আর এমনি করেই সৃষ্টি হচ্ছে পরিচলন স্রোতের (Convection Current). আর তাছাড়া পৃথিবীটাও তো তার আপন বৃত্তে দিন রাত অনবরত বন্ বন্ করে ঘুরছে। এর ফলেই তার ভিতরকার গলিত তপ্ত পদার্থ গুলো ছিট্ কে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করছে।

আমাদের পায়ের নীচেই এই তুলকালাম কাণ্ডটা হচ্ছে দিন রাত। আমাদের পায়ের নীচে যে মাটি আছে ওটা আসলে একটি ভাসমান শিলাস্তর মাত্র। ভিতরকার সেই গলিত উত্তপ্ত পদার্থের উপর এই স্তরটা ভাসছে। এটা মাত্র ৪০ থেকে ৪৮ কিলোমিটার (২৫ থেকে ৪০ মাইল) পুরু। তাও আবার সব জায়গায় সমান পুরু নয়, স্তরের শিলা বা মাটি সমান শক্তও নয়।

পৃথিবীর ভিতরে যে ভয়ানক কাণ্ডকারখানা ঘটছে। তার ফলে ওই পদার্থগুলো সব সময় বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য ধাক্কা মারছে। যেখানকার স্তর অপেক্ষাকৃত পুরু আর শক্ত সেখানেতো ধাক্কাটা সামলে নিতে পারছে, কিন্তু সেখানে স্তর তত পুরু নয়, সেখানেই ঘটছে ভয়াবহ কাণ্ড।

এই প্রচণ্ড ধাক্কায় কম মজবুত শিলাস্তর ফেটে গিয়ে ভিতর থেকে তরল পদার্থ বাইরে বেরিয়ে আসে, বা কোনো কোনো সময় এখানকার মাটি ধ্বসেও যায়। এই ধ্বসে যাওয়া বা ফেটে যাওয়াকে বিজ্ঞানীরা বলেন—ফল্ট (Fault) বা চ্যুতি। আর ভিতরকার গলিত তপ্ত পদার্থকে বলা হয় ম্যাগমা (Magma)।

এই ম্যাগমা সব সময়ই যে শিলাস্তর ফাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে তা নয়। কোনো কোনো সময় ধাক্কায় শিলা ফেটে

না গেলে এই ম্যাগমা স্তরের নীচেই শক্ত হয়ে জমে যায়, ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তখন এরাও শিলাস্তরে পরিণত হয়। কিন্তু যখন এগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে, তখনি সৃষ্টি হয় আগ্নেয়গিরির। তখন



মানচিত্রের কালো অংশগুলো ভূমিকম্প বলয়ের অন্তর্ভুক্ত

এই গলিত ম্যাগমার আর একটি নাম হয়। তখন একে বলা হয় লাভা (Lava).

এই গলিত লাভা বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে আর জমা হতে হতে আস্ত একটা পর্বতের জন্ম হয়ে যায়। একে বলে আগ্নেয়গিরি। এই আগ্নেয়গিরির যে মুখ দিয়ে লাভা বেরিয়ে আসে তাকে বলা হয় জ্বালামুখ বা ক্রেটার (Crater).

এই লাভা বেরিয়ে আসার সময় যে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয়, তখনি আসেপাশের মাটি কেঁপে ওঠে। এই কম্পনই হলো ভূমিকম্প। তবে ভূ-ত্বকের ভিতরকার ম্যাগামার উলটপালটের ফলেও পৃথিবীতে অনবরত ভূমিকম্প হচ্ছে।

এই ভূমিকম্প পৃথিবীর সব জায়গাতে সমান তালে হয় না কোনো কোনো স্থানে খুব ঘন ঘন হয়। এতে বোঝা যায়, যে সমস্ত এলাকায় ভূমিকম্প খুব ঘন ঘন হয়, সেখানকার ভূ-ত্বক খুব পাতলা, শিলাস্তর কম পুরু। বিজ্ঞানীরা বহুদিন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই কমজোরী এলাকাগুলো চিহ্নিত করেছেন। এই এলাকাগুলোর নাম দেয়া হয়েছে—ভূ-কম্প বলয় (Seismic Belt).

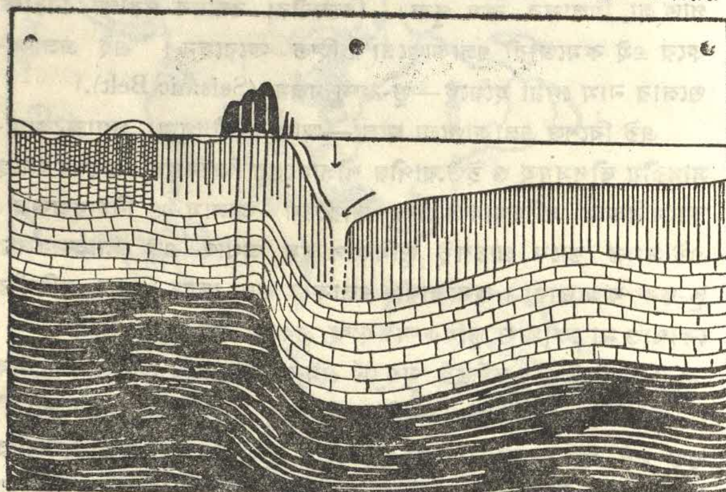
এই বিশেষ এলাকাগুলো হলো—জাপান দ্বীপপুঞ্জ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহ ও ইউরোপীয় শীলাখণ্ডের মিলনস্থল। এরপর আছে আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চল এবং ভারতের আসাম ও বিহারঅঞ্চল। এই সমস্ত স্থানে প্রায়শই ভূমিকম্প হয় অর্থাৎ এই এলাকাগুলোর ভূ-ত্বক কমজোরী। কমজোরী এলাকার কথা ছেড়ে দিলেও পৃথিবীর কোথাও না কোথাও ভূমিকম্প হচ্ছে এবং তা প্রতি মুহূর্তেই।

কিন্তু পৃথিবীর সৃষ্টির মুহূর্তে এমন এক সময় ছিলো, যখন খুব ঘন ঘন প্রবল ভূমিকম্প অনুষ্ঠিত হতো। একেবারে গোটা পৃথিবী শুদ্ধ থর থর করে কেঁপে উঠতো। মুহূর্তে অমন হাজার হাজার কিলোমিটার উঁচু ডাঙ্গা সাগরের তলায় তলিয়ে যেতো। আবার কতো শিলা কেঁপে কেঁপে উঠে আসতো উপর দিক। সৃষ্টি হতো পর্বতের বা বড় বড় পাহাড়ের। পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ যে পর্বতমালা, সেও নাকি এই ভূমিকম্পের ক্রমাগত ধাক্কার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। সে প্রায় পাঁচ কোটি বছর আগেরকথা।

এই কোটি কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীর জন্মলগ্নের সময় এমনি

সব লঙ্কা কাণ্ড ঘটতো। তার কারণ হলো তখন ভূ-ত্বক ছিলো খুব কম পুরু। সবেমাত্র সৃষ্টি হচ্ছে তো। আর পৃথিবীর ভিতরটাও ছিলো আজকের চেয়ে অনেক বেশী গরম। তাই ভেতরের ওলট পালট কাণ্ডটাও তখন বেশী ঘটতো। অবশ্য তখন পৃথিবীতে প্রতিদিন কি ঘটছে না ঘটছে তা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা ছিলো না। কারণ তখন পৃথিবীতে মানুষই ছিলো না।

বিজ্ঞানীরা আজকের পৃথিবীর আকৃতি প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করতে করতে সেদিনের অনেক কথাই জানতে পেরেছেন। আজকে পৃথিবীর স্থল ও জলভাগের যে আকৃতি অর্থাৎ এই আমাদের মহাদেশ আর মহাসাগরগুলোর যে চেহারা, পূর্বে নাকি এমন ছিলো না। এই ভূমিকম্পই নাকি তাদের চেহারা অনেক পালটে দিয়েছে। পূর্বে পৃথিবীতে ডাঙ্গার পরিমাণ অনেক বেশী ছিলো। কিন্তু ভূমিকম্পের ফলেই অনেক বড় বড় মহাদেশ নীচের দিকে বসে গিয়ে সাগরের



ভূমিকম্পের ফলে ঠিক এভাবে শিলাচ্যুতি ঘটে।

তলায় তলিয়ে গেছে। আবার কোনোটা বা পূর্বে যেখানে ছিলো সেখান থেকে সরে অন্য জায়গায় গিয়েছে।

খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৭—৩৪৭তে গ্রীক দেশে প্লেটো নামে এক মস্ত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মনে করতেন, আজকের আটলান্টিক মহা-

সাগরের সবটা জুড়ে আগে সাগর ছিলো না। আটলান্টিস নামে একটি মস্ত বড় দ্বীপ ছিলো। আস্ত একটি মহাদেশের সমান।

কিন্তু এখানকার অধিবাসীদের পাপের ফলেই নাকি এক প্রকাণ্ড ভূমিকম্প এবং প্রলয়কাণ্ডে গোটা দ্বীপই সাগরের তলায় হারিয়ে গেছে।

অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আরো চমৎকার তথ্য আবিষ্কার করেছেন। আজকের যে বিশাল প্রশান্ত মহাসাগর সেখানেও আগে নাকি প্যাসিফিকা নামে একটি মহাদেশ ছিলো। কিন্তু ভূমিকম্পের ফলেই সেই প্রকাণ্ড মহাদেশটা খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গিয়ে তার খণ্ডগুলো মিশে গেছে অন্য বড় ভূখণ্ডের সাথে। বিজ্ঞানীরা সেই হারিয়ে যাওয়া মহাদেশের মূল অবস্থান ও মূল খণ্ডের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন।

বিজ্ঞানীরা আরো মনে করেন যে, আগে আফ্রিকা, ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকা আর দক্ষিণ আমেরিকা একসাথে সংযুক্ত ছিলো

অনেক বছর আগে মিঃ ভেগেনার (Wegener) বলে এক জার্মান বিজ্ঞানীই এটা প্রথম লক্ষ্য করেন। তিনি আটলান্টিক মহাসাগরের চেহারা দেখে অনুমান করলেন যে, এই মহাদেশগুলোকে পাশাপাশি রাখলে যেনো খাপে খাপে মিলে যায়।

তিনি অনুমান করেন, হয়তো এরা অতীতে সত্যি সংযুক্ত ছিলো। ভূমিকম্পের লঙ্কা কাণ্ডের ফলেই এরা ছিটকে পড়েছে। আর মাঝখান থেকে বেরিয়ে এসেছে আটলান্টি মহাসাগর। এটা ঘটেছিলো দশ থেকে পনেরো কোটি বছর আগে।

আমেরিকার মত এমন একটা মহাদেশ ছিটকে বেরিয়ে যেতে হলে কি পরিমাণ কাণ্ড ঘটার প্রয়োজন তা অনুমান করতেই মাথা ঘুরে যায়। অবশ্য এটা সহসা চোখের পলকে ঘটেনি। ঘটেছে লাখো লাখো বছর ধরে। অতিসন্তর্পণে। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন মহীসঞ্চরণ (Continental Drift.).

বিজ্ঞানীরা আরো অনুমান করেন আমাদের ভারত মহাসাগরেও নাকি মস্ত বড় একটা দেশ ছিলো এবং সেটি আমাদের এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ অংশের সঙ্গেই লাগানো ছিলো। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন গাণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। কিন্তু এই ভূমিকম্পরে ফলেই সেই প্রকাণ্ড ভূ-খণ্ডটা ছিঁড়ে ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এ জন্যেই এশিয়ার ভূ-খণ্ডের দক্ষিণ দিকটা যে এতো ছেঁড়া-ফাটা।

এতো গেলো আদ্দিকালের কথা। কিন্তু যখন থেকে পৃথিবীতে জন গণণা শুরু হয়েছে তখনকার কয়েকটা ভূমিকম্পের কথা এবার বলা যেতে পারে।

অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ ৭৯ খ্রীস্টাব্দে ২৪শে আগস্ট ইটালীতে একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। ইটালীর বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি বিষুবিয়াস সহসা একদিন ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জেগে উঠেই এই লঙ্কা কাণ্ড ঘটায়। বিষুবিয়াস থেকে যে লাভা নেমে এসেছিলো তাতে আশ পাশের পাম্পেই ও হার্কুলেনিয়াম শহর দু'টি একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছিলো।

এর প্রায় চারশো বছর পরে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অনুসন্ধান করে সেই শহরগুলোর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন।

এরপর ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে সুমাত্রাব কাছাকাছি এলাকায় প্রচণ্ড একটা ভূমিকম্প হয়। এতে সুন্দা প্রণালীর ক্রাকাতোয়া বলে একটি দ্বীপের প্রায় সবটাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। এটাও ঘটেছিলো একটা আগ্নেয়গিরির অকস্মাৎ অগ্ন্যুৎপাতের ফলে।

এই আগ্নেয়গিরির থেকে যে লাভা বেরিয়ে এসেছিলো তাতে আশে পাশের প্রায় কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো। আর লাভা বেরোনোর বেগ এতো প্রবল ছিলো যে তার বিপুল গর্জন কয়েক হাজার কিলোমিটার দূর থেকেও শোনা গিয়েছিলো আর সেই সাথে প্রচণ্ড কালো ধোঁয়া বেরিয়ে ছেয়ে ফেলেছিলো গোটা আকাশ। এতে লোক মারা গিয়েছিলো নাকি প্রায় ছত্রিশ হাজার।

এরপর ১৯০৬ সালে আরেকটি ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় সানফ্রান্সিস্‌কোতে। এতেও অনেক লোক মারা যায় এবং সানফ্রান্সিস্‌কো শহরটা প্রায় ১৪ হাত নীচে বসে যায়।

১৯০৮ সালের ডিসেম্বরে ইটালীতে আর সিসিলি দ্বীপে এক ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। এতে ম্যাসিনা ও রেজিও নামে দুটি শহর ধ্বংস হয়ে যায় এবং লোক মারা যায় আনুমানিক একলাখ।

এরপর আধুনিক কালে জাপানে একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়ে ১৯২৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। এই ভূমিকম্পটা মাত্রই আধ মিনিট কাল স্থায়ী হয়েছিলো। কিন্তু তাতেই যে ভয়াবহ ধ্বংস যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিলো তা দেখে গোটা বিশ্বের মানুষ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলো।

কতো জায়গায় মাটি ফেটে ভেতর থেকে আগুন বের হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলো চারদিকে। সমুদ্রের জল পাহাড় প্রমাণ উঁচু হয়ে এসে ভাসিয়ে দিয়েছিলো গ্রাম-গ্রামান্তর। লোক মারা পড়ছিলো একলাখের ও উপর। আর সম্পত্তি নষ্ট হয়েছিলো কয়েকশো কোটি টাকার।



ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার দৃশ্য

কিন্তু এরপরেও একটা ভয়ের কথা আছে। বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যৎ-বাণী করেছেন—এই টোকিও শহরে নাকি শীঘ্রই আরেকটি প্রচণ্ডতম ভূমিকম্প হবে। এই ভূমিকম্পটা এত ভয়াবহ হবে যে এতে নাকি টোকিও শহরটার নাম নিশানা পর্যন্ত মুছে যেতে পারে পৃথিবীর বুক থেকে। এটা যে কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে বলে অনুমান করছেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকম্প গবেষণা ইন-ষ্টিটিউটের অধ্যাপক মিঃ কিয়োমোজিরও।

জাপানের আরেক ভূমিকম্প বিজ্ঞানীতো এই জন্য আগে থেকেই প্রাণের ভয়ে টোকিও শহর থেকে ৮০ কিলোমিটার (৫০ মাইল) দূরে সরে বসবাস করতে শুরু করে দিয়েছেন। সবার মনে ভয় কখন যেনো কি ঘটে যায়। এই বুঝি ঘটে গেল ধ্বংসযজ্ঞ।

মে, ১৯৭৬

রহস্যময় সাগরদ্বীপ

গোটা পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ জুড়েই রয়েছে সাগর। আর এই কুলহীন কিনারাহীন সাগরের বুকেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের এই দেশ মহাদেশ আর হাজার হাজার দ্বীপ। দেশ মহাদেশের সংখ্যা তো গোনা যাচ্ছে। কিন্তু এছাড়াও এই সাগরের আনাচে কানাচে এমন কতো যে ছোট বড় দ্বীপ রয়েছে তার হিসেব বের করাই মুশকিল। সেই কোন আদিকাল থেকে দুঃসাহসী নাবিকরা সমুদ্রের বুকে অনুসন্ধান চালিয়ে এই সব দ্বীপের সন্ধান পেয়েছেন।

তবে মজার ব্যাপার হলো—মানুষ সাগরের বুকে এই দ্বীপ খুঁজতে গিয়েই এমন কিছু দ্বীপের সন্ধান পেয়েছে, যেগুলো রীতিমতো রহস্যময়। যেমন তার বিচিত্র স্বভাব তেমনি সেগুলো একেবারেই ক্ষুদ্র।

দেখে মনে হয়—যেনো বিশাল সাগরের বুকে একটি ডুবন্ত পর্বতের মাথা বের হয়ে আছে। কিন্তু আরো অবাক কাণ্ড এই যে এই দ্বীপগুলো একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। হয়তো আজ দেখা গেলো কালো পাথরের মাথাটা তুলে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে—কিন্তু দুদিন পরেই আর সে নেই। হারিয়ে গেছে। এরপর হয় তো কয়েক বছর পরে দেখা গেলো সে আবার মাথা তুলেছে। তাই এদের নিয়ে ভূ-তত্ত্ববিদদের ভারী কৌতূহল। এদের জন্ম-মৃত্যুর রহস্য নিয়ে তারা নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন এদের এই অদ্ভুত ধরনের জন্ম-মৃত্যুর বিচিত্র রহস্য। এদের জন্ম-মৃত্যুর রহস্যময় খেলার মূল নায়ক হলো ভূমিকম্প।

পৃথিবীর স্থল ভাগে যেমন অনেক ভয়ানক ভয়ানক আগ্নেয়গিরি আছে। কিন্তু শুধু স্থলভাগেই নয়—এই বিশাল সাগরের তলদেশেও এমন অনেক আগ্নেয়গিরি লুকিয়ে আছে। এদের বিস্ফোরণেও অনেক তুলকালাম কাণ্ড ঘটে। লাভা উদগীরণ হয়, আগুন ছুটে। গলিত লাভা জমা হতে থাকে তারই চারপাশে সাগরের গভীর প্রদেশে। শত শত বছর ধরে এই লাভা জমে জমে তা এক সময় সাগরের উপর মাথা তুলে দাঁড়ায়। তাই বলে এটা চিরস্থায়ী নয়। আবার

হয়তো প্রকৃতির খেয়ালে একদিন এমন বিস্ফোরণ ঘটলো যে, সবকিছু চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলো মুহূর্তেই। সে কালো দৈত্যের মাথা অদৃশ্য হয়ে গেলো। এমনি কাণ্ড ঘটছে পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত। হয়তো আরো ঘটবে কোটি কোটি বছর ধরে।

এমনি একটা রহস্যময় দ্বীপের নাম হলো—ক্রাকাটোয়া দ্বীপ। এই দ্বীপটির অবস্থান ছিলো—নেদারল্যাণ্ড ইণ্ডিজের জাভা ও সুমাত্রার মধ্যবর্তী সুন্দা প্রণালীর মাঝ বরাবর।

১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের আগেও এর উচ্চতা ছিলো সাগর থেকে প্রায় ১৪০০ ফুট। তখন এর শিরোদেশে ছিলো কিছু গাছপালা আর লতাগুল্ম। পোকামাকড়সহ কিছু কিছু প্রাণীরও অস্তিত্ব ছিলো। কিন্তু এতো সুখ বেচারীর কপালে সইলো না। কে জানতো যে আগুনে পাহাড়ের গলিত লাভা যুগ যুগ ধরে জমা হয়ে তার শরীরটা গড়ে উঠেছে, সেই সর্বনাশা ছাই চাপা আগুনটা আজো তার বুকের গভীরে গুমরে মরছে। অবশেষে যা হবার তাই হলো। ঘুমিয়ে পড়া আগুনের দৈত্যটা সহসা জেগে উঠলো।

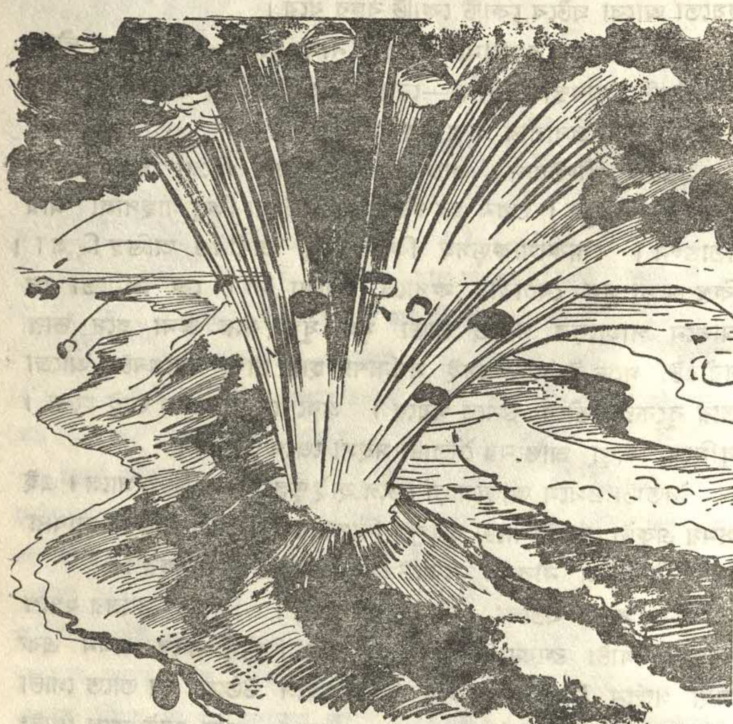
দৈত্যটা প্রথমে আড়মোড়া ভেঙ্গে হাই তুললো—১৬৮০ সালে। এই সময় একটা ছোটো খাটো আগ্নেয় বিস্ফোরণ ঘটলো। তারপর আবার বেশ কিছুকাল নীরব। কেটে গেলো আরো দুশো বছর।

তার পরই ঘটলো সেই প্রলয় কাণ্ড। ১৮৮৩ সালের ২৭শে আগস্ট গোটা ক্রাকাটোয়া দ্বীপের বক্ষ বিদীর্ণ করে এমন এক মহা গর্জনে দৈত্যটা হুংকার দিয়ে জেগে উঠলো যে তাতে গোটা পৃথিবীটাই কেঁপে উঠলো থর থর করে। আর এরই ফলে গোটা ক্রাকাতোয়া দ্বীপটাই গেলো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে।

এ বিস্ফোরণের সময় সাগরের বুকে প্রায় এক হাজার ফুট উঁচু হয়ে ঢেউ জেগে ছিলো। আর সেই পাহাড় প্রমাণ ঢেউয়ে আশে পাশের দ্বীপ সমূহের বহু গ্রাম জনপদ গিয়েছিলো ভেসে—লোক মরেছিলো হাজারে হাজারে।

শুধু তাই নয়—এই ঢেউয়ের ধাক্কা এসে লেগেছিলো সুদূর ভারত মহাসাগরের কেপহর্ণ পর্যন্ত। তারপর প্রবেশ করেছিলো আটলান্টিক মহাসাগরে। এমনকি সুদূর ইংলিশ চ্যানেল পর্যন্ত নাকি তা অনুভব করা গিয়েছিলো।

আর ক্রুদ্ধ দৈত্যরাজ্যের সেই বিকট চিৎকার, সেও নাকি সুদূর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, অস্ট্রেলিয়া, এমনকি মাদাগাস্কার দ্বীপে পর্যন্ত শোনা গিয়েছিলো। ক্রাকাতোয়া থেকে মাদাগাস্কার দূরত্ব প্রায় চার হাজার আট কিলোমিটার।



ক্রাকাতোয়ার বিস্ফোরণ

এ বিস্ফোরণে যে ধোঁয়া উঠেছিলো সে ধোয়া নাকি প্রায় সমস্ত পৃথিবীকেই ঢেকে ফেলেছিলো। বায়ু মণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তর আয়ন মণ্ডল পর্যন্ত চলে গিয়েছিলো। যার ফলে বিস্ফোরণের পরেও পুরো একটা বছর ধরে সূর্যাস্তের সময় নানা বর্ণের দৃশ্যাবলী দেখা যেত।

এই প্রলয় কাণ্ডে গোটা দ্বীপটাই ছিন্নভিন্ন হয়ে সাগর তলে তলিয়ে যায়। শুধু একটা টুকরো জেগেছিলো। লোক তাই সাধ করে এর নাম দিয়েছিলো—আনাক ক্রাকাতোয়া ? মানে ক্রাকাতোয়ার বাচ্চা।

ভূ-তত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন যে, যে বিরাট বিস্ফোরণের ফলে এই দ্বীপটি ধবংস হয়ে গেলো হয়তো এর চেয়েও আরো ভয়াবহ

কোনো এক বিস্ফোরণের ফলেই এর জন্ম হয়েছিলো। দ্বীপটি সাগরের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো হাজার হাজার বছর আগে।

দ্বীপটির মজার গল্পটা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। পুরো দুটো দিন ধরে প্রচণ্ড তর্জন গর্জন আর তুলকালাম কাণ্ড করে আগ্নেয়-গিরিটা যখন একটু শান্ত হলো, তখনই এদিকে নতুন করে নজর ফেরালেন প্রাণী বিজ্ঞানীরা। দ্বীপের সবটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। একটা মাত্র টুকরো তখনো জেগেছিলো জলের ওপর মাথা তুলে। সেখানে কোনো প্রাণী থাকতো দূরের কথা, একটা লতাগুল্মের চিহ্নমাত্রও ছিলো না। একেবারে পোড়া কালো কয়লা।

কিন্তু এর মাত্র ন'মাস পরেই ঘটলো আজব ঘটনা। কটু নামে এক প্রাণীবিদ দেখলেন, এক আজব ব্যাপার। দেখলেন একটি মাকড়সা শিকার ধরার জন্য তার জালবোনা নিয়ে ভারী ব্যস্ত। দেখেতো কটু সাহেবের চক্ষু ছানা বড়া। এই পোড়া কয়লার দ্বীপে কোনো পোকা মাকড়ের যেখানে চিহ্নমাত্র নেই, সেখানে এই মাকড়সা সাহেব কোন জন্তু ধরার জন্য এতো ব্যস্ত হয়ে জাল বুনছে তিনি বুঝতে পারলেন না।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা—স্বয়ং এই মাকড়সা ব্যাটাই বা এখানে এলো কেমন করে? কারণ দুর্ঘটনার পর থেকে কোনো কাক পক্ষীরও এখানে আগমন ঘটেনি। আর তার নিজের পক্ষেও তো এই বিশাল সাগর পাড়ি দিয়ে দ্বীপে আসা সম্ভব নয়। তাহলে? এই নিয়ে চললো গবেষণা। মাকড়সা এলো কেমন করে? অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা আর চিন্তার পর অবশেষে আসল রহস্য খুঁজে পাওয়া গেলো।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখলেন—এই সমস্ত নির্জন দ্বীপে যে সমস্ত প্রাণীর শুভাগমন ঘটে তাদের শতকরা নব্বই ভাগেরই বাহন হলো বাতাস। বিজ্ঞানীরা বলেন,—হাজার হাজার ফুট উপরের বাতাসেও নাকি নানা জাতীয় অদ্ভুত অদ্ভুত প্রাণীর দ্বারা পূর্ণ। সেখানে হাওয়ায় ভেসে দিব্যি আরামে এরা কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ মনের সুখে ডিগবাজিও দিচ্ছে।

বিশেষ ধরনের জাল দিয়ে বিজ্ঞানীগণ এসব প্রাণীর নমুনাও সংগ্রহ করেছেন। এমনি করেই নাকি প্রায় চার কিলোমিটার উপরের বাতাস থেকেও জীবন্ত মাকড়সা ধরা পড়েছে। তা হলে হয়তো এমনি করে হাওয়ার গাড়ীতে চড়েই এরা এই ক্রাকটোয়া দ্বীপে এসে

হাজির হয়েছিলো। অবশ্য এরপর ১৯০৮ সালের দিকে বিজ্ঞানীরা এই ক্রাকাতোয়া দ্বীপে অনেক গাছপালার চারা আর স্তন্যপায়ী প্রাণী আমদানী করে আসর গুলজার করে তুলেছিলেন।

মহাসাগরের বুকে এই ক্রাকোতোয়া জাতীয় দ্বীপ আরো আছে অনেক। যাদের স্বভাব আর গঠন এমনি ভৌতিক। তারা এই আছে তো, এই নেই। কখনো সাগরের বুকে মাথা তোলে, আবার কখনো ডুবে মারে।

এমনি আরেকটি দ্বীপের নাম হলো—'এসেনশন দ্বীপ'। এর অবস্থান ছিলো—দক্ষিণ আটলান্টিকের ব্রাজিলের কুঁজো আর আফ্রিকার স্ফীতির মাঝখান বরাবর। এটিও একটি পোড়া কয়লার নিষিদ্ধ দ্বীপ। এখানে কম করে হলেও ৪০টি মৃত আগ্নেয়গিরি আছে। ১৫০০ সালে দ্বীপটি যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন ছিলো একেবারেই বৃক্ষলতা আর প্রাণী শূন্য একটি পোড়া দেশ।

ভূ-তত্ববিদগণ অনুমান করেন, হয়তো এর এমন দশা চিরকাল ছিলো না। কারণ এখানকার মাটিতে জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। তাতেই বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছেন যে এখানে গাছপালা ছিলো প্রাণীও ছিলো।

অস্ট্রেলিয়ার প্রায় সোয়া তিন হাজার কিলোমিটার পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর ছিলো এমনি আরো একটি দ্বীপ—নাম ফ্যাকন দ্বীপ। মহসোগরের বুকে কচ্ছপের মাথার মতো মাথা জাগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। কিন্তু পারলো না। ১৯১৩ সালে একদিন সে ডুব মারলো।

তারপর ঠিক ১৩ বছর পর আবার মাথা তুললো। তারপর ১৯৪৯ সালে ব্রিটিশরা এটাকে নিজের নামে দখলও করেছিলো। কিন্তু রাখতে পারেনি। ১৯৭৬ সালে আবিষ্কৃত হয় 'বাগোসলোফ' নামে আরো একটি দ্বীপ।

আসলে এদের এই রহস্যময় জন্ম এবং মৃত্যুর বীজ এদের বুকের ভেতরই লুকিয়ে আছে। আগ্নেয়গিরির লাভা। জমে জমে এরা গড়ে উঠেছে। মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে জলের ওপর। কিন্তু যখন আবার বুকের ভেতর লুকানো আগ্নেয়গিরির আগুন বিস্ফোরণ ঘটায় তখন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

মানুষ এদের আর এক বড় শত্রু। কখনো কখনো এই পোড়া কয়লার দ্বীপে পাওয়া যায় দামী পাথর। এসবের সন্ধান পাওয়া গেলে আর বক্ষে নেই। দু'দিনেই তার বুকে শাবল চালিয়ে দেয় শেষ করে। ডুবে যায় সাগর তলে।

হয়তো যুগ যুগ ধরে লাভা জমতে জমতে আবার এরা মাথা উঁচু করে। এইতো তাদের খেলা। এটাই এদের হয়তো ভাগ্যের লিখনও।

জানুয়ারী, ১৯৮০